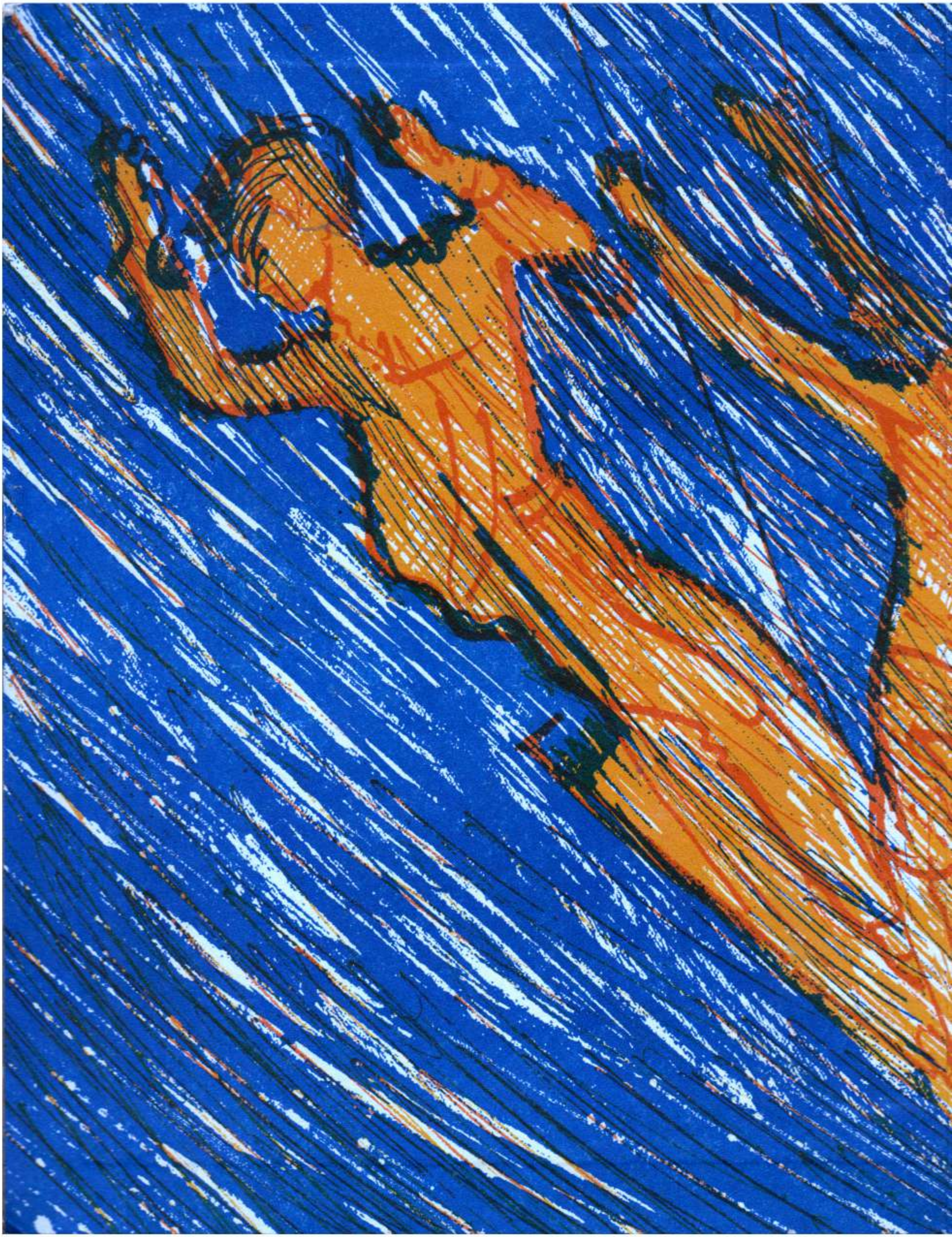

ইউ. ইয়াকভলেভ
রাদুগা
মেঘের তালি খেলা





ইউ. ইয়াকভলেভ

গল্পগুচ্ছ

রঙের ডালি মেলা

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ভ. ইলিউশেংকো

Ю. Яковлев

ИГРА В КРАСАВИЦУ

Рассказы

на языке бенгали

সূচি



বীরব্রতী ভাসিয়া

বন্ধুরা ওকে বলত জরদ্গব। তার ঢিলে-ঢালা, জবুথবু, ভ্যাবাচ্যাকা স্বভাবের জন্যে। ক্লাসে কোনো সাপ্তাহিক পরীক্ষার সময় কখনোই ওর সময়ে কুলাত না, প্রশ্নটা মাথায় ঢুকতে ঢুকতে ঘণ্টা পড়ে যেত। চা খেতে বসলে তার টেবিলে পিরিচের চারপাশে জমত চায়ের ডোবা। চলত এদিক-ওদিক হেলে দুলে, নির্ঘাৎ ধাক্কা খেত টেবিলের কানায়, নয়ত উল্টে পড়ত চেয়ার। নতুন জুতো হপ্তার মধ্যেই এমন তুবড়ে যেত যেন ওই পরে সে সেনাপতি সুভোরভের সঙ্গে আল্প্স্ পর্বত পেরিয়েছে। মুখের ভাব ঢুলুঢুলু, যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙল, নয়ত এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। সবকিছুই ওর খসে পড়ত হাত থেকে, কিছুই উৎরাত না। এক কথায় জরদ্গব।

গায়ে আঁট হয়ে বসত কোট, প্যাণ্টে পা ঢুকত কোনোক্রমে। মুটকো মুখের ওপর থলথলে তিন থাক-মাংস: দুটি চোখের ওপরে, ভুরুর গোড়ায়, তৃতীয়টি নাক আর

ওপরের ঠোঁটের মাঝামাঝি। যখন ও উত্তেজিত হয়ে উঠত অথবা বাইরের হিম থেকে ফিরত, তখন এই থাকগুলোই লাল হয়ে উঠত সবার আগে।

সবাই ভাবত ওর স্থূলতার কারণ ওর পেটুকত্ব: নইলে অত মোটা সে হল আর কী থেকে? আসলে কিন্তু খেত সে কম। ভালো লাগত না তার খেতে। ও কম্মটি সে সইতেই পারত না।

ও যে জরদ্‌গব সেটা লেখা ছিল ওর মুখে, জানান দিত তার শিথিল, এলিয়ে-পড়া ভাবভঙ্গিতে, শোনা যেত তার চাপা-চাপা গলার স্বরে। অসুন্দর এই মোটা দেহের তলে কী লুকিয়ে ছিল সেটা কেউ জানত না।

অথচ বুকের তলে ওর স্পন্দিত হত বীরব্রতীর মহানুভব হৃদয়। নিজের নিভৃত স্বপ্নে ও নিজেকে দেখতে পেত ঝকমকে ইস্পাতের বর্ম পরা, পালক-ওড়ানো শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ নামানো, চেপে আছে স্ফুরিত-নাসা শাদা ঘোড়ার পিঠে। এই বেশে সে ছুটে বেড়াচ্ছে দুনিয়ায়, দুর্বল ও অন্যায়-পীড়িতদের রক্ষা করে অসংখ্য কীর্তি স্থাপন করছে। ও হল নামহীন এক নাইট। কেননা নাইটদের সাধারণত থাকে গালভরা বিদেশী নাম—রিচার্ড কিংবা রোদরিগো অথবা আইভ্যানগো। আর ওকে সবাই ডাকে ভাসিয়া বলে, ও নামটা মোটেই কোনো নাইটকে মানায় না।

স্বপ্নে তার ধুমসো বেঢপ চেহারাটা হয়ে ওঠে সুঠাম আর নম্র, গতিতে দেখা দেয় ক্ষিপ্রতা আর নৈপুণ্য। ঝকমকে বর্মের তলে সব ত্রুটি ওর চাপা পড়ে যায় মুহূর্তে।

তবে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আবার সবই ফিরে আসত স্বস্থানে। অপরূপ এক নাইটের বদলে সে সামনে দেখতে পেত জালার মতো একটা ছেলে, গোল মুটকো মুখে তার লাল হয়ে উঠেছে থাক তিনটে।

নাইটের অযোগ্য চেহারাটার জন্যে সে এ রকম সময় নিজেকেই ক্ষমা করতে পারত না।

বিদ্রূপ-পরায়ণ আয়নাটা ছাড়াও তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনত তার মা। তার পদপাতে গেলাসগুলো করুণ আর্তনাদ তুলেছে শুনতে পেয়ে মা রান্নাঘর থেকে চেঁচাত:

'সাবধান! একেবারে হাতি ঢুকেছে চীনেমাটির দোকানে!'

এমন কথা কিনা এক মহানুভব নাইটকে?

বন্ধুর কাছে তার স্বপ্নের কথা বলতে গিয়েছিল সে, কিন্তু কোনো সমর্থন পেলে না।

বর্মের কথা শুনতেই বন্ধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে:

'অমন মোটা শরীর কোনো বর্মেই ঢুকবে না।'

বন্ধু ভাবতেও পারে নি সে ভাসিয়ার একেবারে আঁতে ঘা দিয়েছে।

সময় পেলেই সে ছুটত মিউজিয়মে। বড়ো বড়ো হলে এখানে ভারি ভারি সোনালী ফ্রেমে ছবি টাঙানো, কোণে কোণে হলুদ হয়ে আসা মর্মরের মূর্তি। মহাশিল্পীদের ক্যানভাসগুলো সে পেরিয়ে যেত নির্বিকারভাবে, যেন সেগুলো বহুপরিচিত পোস্টার মাত্র, চলে যেত তার স্বপ্নের ঘরটিতে। কোনো ছবি ছিল না এখানে। দেয়ালে টাঙানো তরোয়াল আর বর্শা, মেঝেয় দাঁড়িয়ে বর্মাবৃত সব নাইট-মূর্তি।

ডিউটি-রত বুড়িটাকে লুকিয়ে সে ছুঁয়ে দেখেছিল বর্মের ইস্পাৎ, আঙুলে পরখ করেছিল তরোয়ালে ধার কেমন। কালো নাইটের কাছ থেকে সোনালী, সোনালী থেকে রুপোলী নাইটের কাছে সে চলে যেত আপন মনে। কতকগুলোর সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব, কারো প্রতি সংযত উদাসীনতা। মাথা নাড়ত সে তাদের দিকে, তারপর মনে মনে চলত তাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। তার মনে হত, নামানো মুখাবরণের ফাঁক দিয়ে নাইটরা তাকে চেয়ে দেখছে, কেউ তাকে ঠাট্টা করছে না, বলছে না সে জরদ্‌গব।

কেন যে ভুল হয় প্রকৃতির, ডন-কুইক্‌জোটের গর্বিত প্রাণটাকে সে দিয়ে বসে সাঞ্চো-পান্‌সার মুটকো বেঢপ দেহে?

বীরকীর্তির স্বপ্ন দেখত সে, জীবন কিন্তু বয়ে চলল একঘেয়ে মামুলী খাতে। রোজ সকালে ও অনিচ্ছায় বিছানা ছাড়ত, আর 'তাড়াতাড়ি কর, নইলে দেরি করে ফেলবি' — মায়ের এই ধমকের তাড়ায় প্যাণ্ট শার্ট চাপাত গায়ে। তারপর মুখ ধুতে গিয়ে নাকটুকু ভেজাত জলে — 'এই তোর মুখ ধোয়ার ছিরি?!' — এবং অনিচ্ছায় বসত টেবিলে। চামচে দিয়ে কিছু মোহনভোগ ঘেঁটে —— 'খেতে এসে ঘুমতে হবে না!' — উঠে পড়ত, চলে যেত ইশকুলে। হুড়মুড়িয়ে নামত সিঁড়ির ধাপ থেকে ধাপে, সবকটি ফ্ল্যাটের জানা থাকত কে যাচ্ছে। ক্লাসে সে পৌঁছত দ্বিতীয়

ঘণ্টির পর। বইয়ের ভারি ব্যাগটা ধপ করে ফেলে সেঁধত বেঞ্চিতে, ডেস্কটা ঠেলে সরিয়ে দিত সামনে।

এ সবই সে করত একঘেয়ে জীবনে অভ্যস্ত এমন একটা লোকের নিরুদ্বেগ প্রশান্তি নিয়ে যে অপ্রত্যাশিতের কোনো আশাই রাখে না।

ক্লাসে সে গোলমাল করত না, কেননা কথা বলা তার এমনিতেই আসে না, তাহলেও অবিরাম ধমক খেতে অসুবিধা হত না কোনো।



'রীবাকভ, মন তোর কোথায়, কী ভাবছিস?'

'রীবাকভ, কী বললাম বল।'

'রীবাকভ, বোর্ডে এসে অঙ্কটা বুঝিয়ে দে।'

পা দিয়ে ডেস্কে ধাক্কা মেরে সে চলে যেত বোর্ডে, আঙুল দিয়ে খড়িটা চিপত অনেকক্ষণ, যেন তা থেকে রস নিঙড়াতে চাইছে। অঙ্কটা কষার সময় এমন হাঁস-ফাঁস করত, যেন খড়ি নয়, হাতে ওর একটা ভারি পাথর, ক্রমাগত সেটা সে ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। ভাবতে তার এত সময় যেত আর কষ্ট হত যে শিক্ষয়িত্রীর ধৈর্যে কুলাত না, ফেরত পাঠাত তার নিজের জায়গায়।

এসে বসত সে, মুহূর্তেই ডেস্কটা পরিণত হত এক জঙ্গী ঘোড়ায়, বেঁটে মোটা-মোটা আঙুলগুলো নিজেরাই এঁকে নিত তরোয়াল আর বর্ম।

ব্যায়ামের ক্লাসে সে ছিল সার্বজনীন উপহাসস্থল। ওর যখন বারে হাঁটার পালা আসত, আগে থেকেই হাসি শুরু হয়ে যেত ছেলেদের মধ্যে। বহু কষ্টে কয়েক পা গিয়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে অসহায়ের মতো বাতাস খামচে শেষ পর্যন্ত ধপাস্ করে ঝাঁপিয়ে পড়ত মেঝেয়। ভল্টিং হর্সও সে ডিঙিয়ে যেতে পারত না, আটকে যেত তার কালো চামড়ায় বাঁধানো পিঠে। কিছুক্ষণ সেখানেই সে বসে থাকত জিনে বসা সওয়ারের মতো। হেসে উঠত ছেলেরা আর আনাড়ীর মতো পেটে ভর দিয়ে নেমে গিয়ে ও দাঁড়াত তাদের লাইনে।

একেবারে কিছুই তার উৎরাত না। ইশকুলের অনুষ্ঠানে সে আবৃত্তি করে 'নীপারকে বললে মানুষ' কবিতাটা, তাতেও গোলমাল ঘটে যায়। গোটা সপ্তাহ ধরে সে কবিতাটা রপ্ত করে। বিশেষ করে শেষ ছত্রগুলো ওর বেশ হত। বুক ভরে দম নিয়ে সে আবেগ ফুটিয়ে বলত:

সরণিতে গৃহকোণে যেন
সন্ধ্যায় জ্বলে ওঠে আলো!

মঞ্চে এসে যখন সে দাঁড়াল, উবে গেল তার সমস্ত 'আবেগ'। তাড়াতাড়ি করে শেষ ছত্রে পেঁছিবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু ঠিক শেষটাতেই সর্বনাশ হল। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে কাঁধ নাচিয়ে সে বলে উঠল:

সরণিতে গৃহকোণে যেন
সন্ধ্যায় নিভে যায় আলো!

হেসে উঠল দর্শকেরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ধপ্ করে নেমে এল মঞ্চ থেকে।

ব্যর্থকামের ভাগ্যে সে অভ্যস্ত। ব্যর্থরা সাধারণত রাগ করে অন্যের ওপর, ওর রাগ হত নিজের ওপরেই। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বভাব বদলাবে, নতুনভাবে চলবে। চেষ্টা করেছিল চটপট হাঁটবে, কথা কইবে প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, পেছিয়ে থাকবে না কারো কাছ থেকে। কিন্তু তাতে সুফল কিছু হল না। বাড়িতে পেয়ালা ভাঙতে লাগল, ক্লাসে উলটে পড়তে লাগল কালির দোয়াত, আর চটপটে হতে গিয়ে কোর্তাটা ফেটে গেল বগলের তলায়।

...হেমন্ত আর শীতের মধ্যে সীমারেখা টানা মুশকিল। মাঝে মাঝে এমন হয় যে গাছের পাতা তখনো সব ঝরে যায় নি, অথচ মাটিতে পড়ে আছে প্রথম শীতের মৃদু তুষারকণা। মাঝে মাঝে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে যায়, সকালে দেখা যায় নদী ঢেকে গেছে বরফে। পাতলা আয়নার মতো সে বরফ ছেলেদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, মাইকে তখন হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় যে বরফের ওপর হাঁটা বিপজ্জনক।

কিন্তু সে হুঁশিয়ারি তো আর সব ছেলের কানে যায় না। তাই বরফের ওপর দেখা দেয় প্রথম একদল দুঃসাহসী। দেবে যায় বরফ, ভয়ঙ্কর সব ফাটল দেখা দেয়, আর ওরা ভাবে তাদের সবারই জন্ম খুব শুভলগ্নে। কিন্তু শুভলগ্নও তো মাঝে মাঝে ডোবায়।

নদী থেকে আসা একটা চিৎকার কানে এল জরদ্গবের। দ্রুত পা চালিয়ে হাঁস-ফাঁস করে সে পেঁছিল তীরে।

সেখানে সে দেখতে পেলে দিমকা কভালেভ হাত নেড়ে চেঁচাচ্ছে:

'ডুবছে! ডুবে যাচ্ছে!'

'কে ডুবছে?' এতটুকু তাড়া না দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে জরদ্গব।

'দেখতে পাচ্ছিস না?' খেঁকিয়ে উঠল দিমকা, 'বাচ্চাটা ডুবে যাচ্ছে। বরফ ভেঙে জলে পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে রইলি যে?!'

অন্য কেউ হলে দিমকা কভালেভকেই বলত, 'আর তুই নিজে যেতে পারছিস না?' কিন্তু ও যে জরদ্‌গব, তাই এ কথাটা তার খেয়ালই হল না। জমে যাওয়া নদীটার দিকে চাইলে সে, চোখে পড়ল প্রথম শ্রেণীর একটা বাচ্চা কোমর পর্যন্ত জলে ডোবা, কোনো রকমে বরফের কানাটা আঁকড়ে আছে হাত দিয়ে।

দিমকার চেয়ে জরদ্‌গব মোটা এবং ভারি, তাহলেও সে এগিয়ে গেল বরফের ওপর দিয়ে। বরফের স্তরটা সামান্য দেবে গেল, কিন্তু ভাঙল না। তীরের কাছাকাছি স্তরটা নিশ্চয় অনেক শক্ত।

উত্তেজিত হয়ে উঠল দিমকা কভালেভ। হাত নেড়ে সে ফের চেঁচাতে লাগল:

'ডাইনে যা!.. সাবধান!.. অমন জোরে জোরে পা ফেলিস না, নইলে নিজেই...'

চেঁচাচ্ছিল সে তার নিজের ভয়টাই চাপা দেবার জন্যে।

আর জরদ্‌গব এগিয়ে গেল বরফের ওপর দিয়ে। চেঁচানি তার কানে যাচ্ছিল না। দেখছিল সে কেবল মরণাধিক আতঙ্কিত বাচ্চাটাকে, মুখ দিয়ে যার একটা কথাও সরছিল না।

কিনারের কাছাকাছি বরফ চাঙের ওপর জল জমেছে। সেখান পর্যন্ত গিয়ে সে এতটুকু দ্বিধা না করে পা বাড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই জুতো ভরে উঠল জলে। মনের কোন গভীরে সে টের পাচ্ছিল, এক্ষুনি বরফটা ভেঙে যেতে পারে, নীল হয়ে যাওয়া বাচ্চাটার সঙ্গে সেও গিয়ে পড়বে জলে। কিন্তু তাতে সে থামলে না। দ্বিতীয় পা-টাও সে এগিয়ে আনলে, জল উঠল গোড়ালি ছাপিয়ে।

এখন আর চেঁচাচ্ছিল না কভালেভ, হাত নাড়ছিল না, টান-টান হয়ে অপেক্ষা করছিল কী হয়। দেখতে পাচ্ছিল বাচ্চাটার হাত ধরছে জরদ্‌গব, বরফ ভাঙতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা উঠে এল বরফের ওপর। অবশ হাতে তার পরিত্রাতাকে আঁকড়ে ধরে আসছিল সে। দাঁত ঠক-ঠক করছিল। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল মুখ বেয়ে।

ওরা তীরে পেঁছিতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল কভালেভ।

'বরফ জলে তোর পা একদম ভিজে গেছে,' বললে সে বন্ধুকে, 'শিগগির ছুটে বাড়ি যা। বাচ্চাটাকে আমি পেঁছে দেব।'

উদ্ধার-করা ছেলেটার দিকে চাইলে জরদ্গব, নিজের ভেজা জুতোর দিকে চেয়ে বললে:

'বেশ, পৌঁছে দে!'

আতঙ্কিত ভেজা বাচ্চাটিকে ধরে কভালেভ কোথায় তাকে নিয়ে গেল।

বাড়িমুখো ফিরল জরদ্গব। উত্তেজনা ওর দ্রুত চাপা পড়ে গেছে ক্লান্তিতে। এখন আছে শুধু তার ভেজা পা আর হি-হি করা সামান্য কাঁপুনি।

বাড়ি ফিরে বহু কষ্টে জুতো খুলল সে। গলগলিয়ে জল বেরল জুতো থেকে।

'এ আবার কী কাণ্ড?' ভেজা মেঝে দেখে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

'পা ভিজে গিয়েছিল,' টেনে টেনে সে জবাব দিলে।

'কোথায় এসব বাধাস বল্ তো?' বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ন্যাতা আনতে গেল মা।

ওর ইচ্ছে হয়েছিল ঘটনাটা মাকে বলে, কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল তার, কেবলি হাই উঠছিল, গরম ঘরের মধ্যেও গায়ের কাঁপুনি যাচ্ছিল না। কিছুই বললে না সে, সোফায় শুয়ে চোখ বুজলে।

হঠাৎ তার মনে হল, গায়ে তার নাইটের ভারি বর্ম পরা থাকলে তো বরফটা তক্ষুনি ভেঙে যেত, বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেত না।

চট করেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরের দিন দ্বিতীয় ঘণ্টির পর সে ক্লাসে এসে কাউকেই সেখানে দেখতে পেল না। জানা গেল সবাই ওপরের বড়ো হলে গেছে পাইওনিয়র জমায়েতে। ডেস্কে বইয়ের ব্যাগ ফেলে সে উঠল চারতলায়।

হলে ঢুকে সে দেখল সবাই দাঁড়িয়ে আছে লাইনবন্দী। ঠেলে-ঠুলে সে পেছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন কথা কইছিলেন ইশকুলের হেডমাস্টার। তিনি বললেন যে গতকাল প্রথম শ্রেণীর একটি ছেলে নদীতে বরফ ভেঙে জলে পড়ে যায়, ছাত্র দিমকা কভালেভ তাকে বাঁচিয়েছে, ছাত্রের এই নির্ভীকতায় তিনি, হেডমাস্টার উচ্ছ্বসিত বোধ করছেন।

তারপর বক্তৃতা দিলেন জ্যেষ্ঠা পাইওনিয়র পরিচালিকা। তিনি পাইওনিয়রের

দায়িত্ব, লাল টাইয়ের মর্যাদার কথা বলে জলে-পড়া বাচ্চাটার মায়ের চিঠি পড়ে শোনালেন, তাতে দিমকাকে তার ছেলের উদ্ধারকর্তা বলা হয়েছে।

চারিদিক থেকে ছেলেপিলেদের চাপে জরদ্‌গব দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে শুনে গেল সবাই তারিফ করছে দিমকা কভালেভের। একসময় তার ইচ্ছে হয়েছিল বলে যে দিমকা মিথ্যে কথা বলেছে, কাউকেই সে বাঁচায় নি, শুধু হাত নেড়ে চেঁচিয়েছে। কিন্তু তাতে সবার দৃষ্টি তার ওপর পড়বে এই কথা ভাবতেই তার লজ্জা লাগল, লাল হয়ে উঠল তার তিন-তিনটে থাক।

শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই বিশ্বাস হতে লাগল যে দিমকাই গতকালকার ঘটনার নায়ক: ডুবন্ত ছেলেটাকে ওই তো দেখেছিল প্রথম। আর সবাই যখন হাততালি দিলে দিমকাকে, জরদ্‌গবও তাতে যোগ দিলে।

জমায়েত শেষ হল। হুকুম হল যে-যার ক্লাসে যাবার। জরদ্‌গবও বন্ধুদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ফিরে এল দোতলায়।

কষ্ট করে তার সীটে সেঁধল সে, সরে গেল ডেস্কটা, — আর পড়া শুরু হতে সে তার মোটা-মোটা খাটো আঙুলে সরু কলম ধরে নাইটের ছবি আঁকতে লাগল অঙ্কের খাতায়। এ নাইটটা হল বেগুনী রঙের, ইশকুলের কালি ওই রঙেরই।



রুপের ডালি খেলা

তখন আমরা ভাবতাম যে কারাভান্নায়া রাস্তায় নিশ্চয় ঠুন-ঠুন ঘণ্টি বাজিয়ে যায় ক্লান্ত ধূলি-ধূসর উট, ইতালিয়ানস্কায়া রাস্তায় থাকে কালো-চুল ইতালিয়ানরা, আর চুমকুড়ি সাঁকোতে সবাই চুমু খায়। পরে মিলিয়ে গেছে কারাভান আর ইতালিয়ানরা, রাস্তাগুলোর নাম পর্যন্ত এখন অন্য। অবিশ্যি চুমকুড়ি সাঁকোর নামটা এখনো তাই আছে।

আমাদের পাড়ার আঙিনাটা ছিল পাথরের খোয়ায় বাঁধানো। খোয়া পড়েছিল সমানভাবে নয়, কোথাও উ'চু কোথাও নিচু। জোর বৃষ্টি হলে নিচু জায়গাগুলো জলে ভরে যেত, উ'চুগুলো থাকত পাথুরে দ্বীপের মতো। জুতো যাতে না ভেজে তার

জন্যে আমরা দ্বীপ থেকে দ্বীপে লাফিয়ে লাফিয়ে আসতাম। তাহলেও বাড়ি পেঁছতাম ভেজা পায়েই।

বসন্তে আঙিনাটা ভরে উঠত পপ্‌লারের ঝাঁঝালো রজনের গন্ধে, শরতে আপেল। আপেলের গন্ধটা আসত মাটির তলের কুঠরি থেকে, শব্জী জমা থাকত সেখানে। আঙিনাটা আমরা ভারি ভালোবাসতাম। কখনোই একঘেয়ে লাগত না। তাছাড়া অনেক খেলা জানতাম আমরা। খেলতাম লুকোচুরি, ডাংগুলি, বল ছোঁড়া-ছুঁড়ি, ভাঙা টেলিফোন। এসব খেলা আমরা পেয়েছিলাম একটু বড়ো ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিশেবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের বানানো খেলাও ছিল। যেমন রূপের ডালি খেলা।

কার মাথা থেকে এটা বেরিয়েছিল জানি না, তবে আমাদের বেশ মনে ধরেছিল। পুরনো পপ্‌লার গাছের দলটা জুটলেই নির্ঘাৎ কেউ-না-কেউ বলে উঠত:

'আয় রূপের ডালি খেলি!'

সবাই দাঁড়াতাম গোল হয়ে, ছড়া বলে পর পর গুণে যেতাম কে মাঝখানে দাঁড়াবে:

'এনা, বেনা, রেস...'

কোন এক দুর্বোধ্য ভাষার এই কথাগুলো ছিল আমাদের ঠোঁটস্থ:

'কুইন্তের, কন্তের, জেস!'

কেন জানি আমরা সাত নম্বর ফ্ল্যাটের নিন্‌কাকে মাঝখানে দাঁড় করাতে ভালোবাসতাম, চেষ্টা করতাম যাতে ছড়াটা গিয়ে ঠিক ওর কাছেই শেষ হয়। চোখ নামিয়ে সে তার ফ্রকে হাত বুলাত। আগে থেকেই তার জানা থাকত যে তাকেই মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে রূপসী হয়ে।

এখন আমরা বুঝি যে সাত নম্বর ফ্ল্যাটের নিন্‌কা ছিল অসাধারণ অসুন্দর: চওড়া খাঁদা নাক ছিল তার, মোটা মোটা ঠোঁট, তার চারিপাশে আর কপালে রুটির গুঁড়োর মতো ছুলি। বিবর্ণ চোখ। সোজা সোজা অঘন চুল। হাঁটত পা ঘষে ঘষে, পেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে। কিন্তু এসব তখন আমাদের চোখে পড়ত না। যে ন্যায়পর অজ্ঞতায় আমরা তখন ছিলাম তাতে ভালো মানুষকে ধরা হত সুন্দর,

খারাপকে অসুন্দর। আর সাত নম্বর ফ্ল্যাটের নিন্‌কা ছিল গুণী মেয়ে, তাকেই আমরা সুন্দরী করতাম।

মাঝখানে গিয়ে ও দাঁড়ালেই খেলার নিয়ম অনুসারে আমাদের 'মুগ্ধ হতে' হত — প্রত্যেকেই আমরা প্রশংসা করতাম বইয়ে-পড়া কোনো-না-কোনো কথা দিয়ে। কেউ বলত:

'কী সুন্দর গলা, রাজহাঁসের মতো।'

'রাজহাঁসের মতো নয়, মরাল গ্রীবা,' সংশোধন করে দিয়ে আরেকজন খেই টানত, 'কী সুন্দর প্রবালের মতো ঠোঁট...'

'কী সুন্দর সোনালী চাঁচর।'

'চোখ ওর ইয়ে... ইয়ে...'

'কেবলি তুই ভুলে যাস! সাগরের মতো নীল।'

জ্বল-জ্বল করে উঠত নিন্‌কা। ফ্যাকাশে মুখে গাঢ় লাল ছোপ। পেটটা গুটিয়ে নিয়ে সে লীলাময়ীর মতো একটা পা এগিয়ে দিত। আমাদের কথাগুলো হয়ে উঠত আয়না, নিনকা তাতে নিজেকে দেখত সত্যিকারের রূপসী।

'কী সুন্দর চিকন গা।'

'কী সুন্দর বাঁকা ভুরু।'

'ওর দাঁত... দাঁত...'

'জানিস না? মুক্তোর মতো দাঁত!'

আমাদেরও মনে হতে থাকত সবকিছুই ওর মরাল, প্রবাল, মুক্তোর মতো। আমাদের নিনকার চেয়ে রূপসী আর কেউ নেই।

তারপর আমাদের উচ্ছ্বাসের ঝুলি ফুরিয়ে গেলে নিনকা কিছু একটা গল্প শোনাত। হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাসে গা কুঁকড়ে সে বলত:

'কাল আমি ভাই চান করছিলাম গরম সাগরে। বেশ রাত হতেই অন্ধকারে জ্বল-জ্বল করে উঠল সাগর। আমিও জ্বল-জ্বল করে উঠলাম। আমি ছিলাম একটা মাছ হয়ে... না, মাছ নয়, মৎস্য-কন্যা।'

রূপসীর কি কখনো বলা সাজে যে সে আলুর খোসা ছাড়িয়েছে, অথবা পড়া মুখস্থ করেছে, কিংবা কাপড় কাচতে সাহায্য করেছে মাকে।

'কাছেই হুটোপুটি করছিল সব ডলফিন। তারাও জ্বল-জ্বল করে উঠল।'

এই সময় কেউ হয়ত আর চুপ করে থাকতে পারত না। বলত:

'যাঃ, বাজে কথা!'

হাত বাড়িয়ে দিত নিনকা।

'বেশ, শুঁকে দ্যাখ। গন্ধ পাচ্ছিস?'

'সাবানের গন্ধ।'

মাথা নাড়ত নিনকা:

'উঁহুঁ, সাগরের গন্ধ! চেটে দ্যাখ হাত — নোনতা-নোনতা।'

চারিপাশে ঘোলাটে স্যাঁৎসেঁতে আবছায়া, বোঝা যায় না বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। শুধু শার্সিতে জাগছে আর ফেটে যাচ্ছে বুদ্বুদ। কিন্তু সবাই আমরা টের পেতাম না-থাকা সমুদ্রটা আছে কাছেই — উষ্ণ, জ্বলজ্বলে, নোনা।

এই ভাবেই খেলতাম আমরা।

বৃষ্টি নামলে জুটতাম ফটকের তলে। অন্ধকার হয়ে গেলে ভিড়তাম ল্যাম্পপোস্টের কাছে। এমনকি কড়া শীতও আমাদের হঠাতে পারত না আঙিনা থেকে।

একবার নতুন বাসিন্দা এল পাড়ায়। আঙিনায় দেখা দিল নতুন একটি ছেলে। ঢ্যাঙামতো, হাঁটত একটু কুঁজো হয়ে, যেন দেখাতে চাইত যে তত ঢ্যাঙা নয়। গালে তার একটা বড়ো লম্বাটে তিল, সেটার জন্যে লজ্জা হত তার, কথা বলার সময় অন্য গালটা ফিরিয়ে রাখত আমাদের দিকে। নাকটা তরতরে, একেবারে মেয়েলী বড়ো বড়ো চোখের রোঁয়া। চোখের রোঁয়ার জন্যেও সঙ্কোচ ছিল তার।

আমাদের থেকে দূরে দূরে থাকত নতুন ছেলেটা। আমরা ওকে রূপের ডালি খেলতে ডাকি। জানত না খেলাটা কী, রাজী হয়ে যায়। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে আমরা ঠিক করে নিলাম রূপসী করব... ওকেই। মরাল গ্রীবা আর প্রবাল ঠোঁটের কথা বলতে-না-বলতেই ও ভয়ানক লাল হয়ে পালিয়ে গেল খেলা ছেড়ে।

হেসে উঠে আমরা চেঁচালাম:

'তোকে ছাড়াই আমরা খেলব!'

কিন্তু ফের যখন গোল হয়ে দাঁড়ালাম, হঠাৎ নিনকা পেছিয়ে এল:

'আমিও খেলব না...'

হৈ-হৈ করে উঠলাম আমরা:

'এ আবার কী কথা? কেন খেলবি না?'

'এমনি,' আমাদের কাছ থেকে চলে গেল নিনকা।

সঙ্গে সঙ্গেই খেলার সাধ উবে গেল আমাদের। বিচ্ছিরি লাগল। আর নিনকা নতুন ছেলেটার কাছে গিয়ে বললে:

'রূপের ডালি খেলার সময় কেবলি আমায় বাছে।'

'তোকে? কিন্তু তোকে কেন?' অবাক হল ছেলেটা, 'তুই কি রূপসী নাকি?'

ছেলেটার সঙ্গে আমরা তর্ক করলাম না। শুধু হাসাহাসি করলাম ওর উদ্দেশে। আর নিনকার মুখখানা কেমন বসে গেল, মুখ আর কপালের ছুলিগুলো হয়ে উঠল আরো কটকটে।

'কিন্তু আমাকেই বাছে।'

'খুবই খারাপ করে,' বললে ছেলেটা, 'তাছাড়া তোদের এই সব ছেলেমানুষী খেলায় আমার আদপেই কোনো শখ নেই।'

'বটেই তো।' কেন জানি চট করেই তার কথায় সায় দিলে নিনকা।

নতুন ছেলেটা দেখা দেবার পর থেকে কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠল সে। যেমন, রাস্তায় ছেলেটার পেছু-পেছু যেত সে। যেত চুপি-চুপি, রাস্তার অন্য ধার দিয়ে, যাতে কারো চোখে না পড়ে। তবে আমাদের চোখে পড়েছিল বৈকি। ভাবলাম নিনকার মাথা খারাপ হয়েছে, অথবা কিছু একটা খেলছে। হয়ত গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলা। ছেলেটা যেত রুটির দোকানে, ও দাঁড়িয়ে থাকত উল্টো দিকে, দরজার শার্সি থেকে চোখ সরাত না। সকালেও সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত ওর জন্যে, ইশকুল পর্যন্ত যেত তার পেছু-পেছু।

নতুন ছেলেটা প্রথমে টের পায় নি যে সাত নম্বর ফ্ল্যাটের নিনকা তার পেছু-পেছু ফেরে ছায়ার মতো। যখন ধরতে পারল, ভারি চটে গেল সে। ধমক দিলে:

'খবরদার, পেছু-পেছু আসবি না বলছি!'

কোনো জবাব দিলে না নিনকা। ফ্যাকাশে মেরে চলে গেল। আর ছেলেটা তার উদ্দেশে চ্যাঁচালে:

'আয়নায় বরং নিজের মুখখানা একবার দ্যাখ গে যা!'

আয়নায় মুখ দেখতে বললে সে। অথচ কেমন আমাদের নাক, মুখ, থুতনি, কোথায় উঁচিয়ে উঠেছে চুল, ব্রণ বেরিয়েছে — এসব জানার কোনো আগ্রহই আমাদের ছিল না। নিনকাও শুধু একটা আয়নাই জানত, রূপের ডালি খেলার সময় যে-আয়না হতাম আমরা। বিশ্বাস করত সে আমাদের। আর গালে তিল-ওয়ালা এই ছোঁড়াটা কিনা ভেঙে দিল আমাদের আয়নাটা। হাসিখুশি, মায়াময়, জীবন্ত আয়নার বদলে দেখা দিল ঠাণ্ডা, মসৃণ, নিষ্করুণ একটা জিনিস। জীবনে এই প্রথম তাতে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল নিনকা — রূপসীকে খুন করলে আয়না। যতবারই আয়নার কাছে গেছে নিনকা, ততবারই কী একটা যেন মরে গেছে তার ভেতর। অদৃশ্য হল মরাল গ্রীবা, প্রবাল দাঁত, সাগর-নীল চোখ।

তখন কিন্তু সেটা আমরা বুঝি নি। মাথা কুটে মরতাম আমরা — কী হল ওর? নিজেদের সইকে আমরা চিনতেই পারতাম না। কেমন পর-পর, দুর্বোধ্য হয়ে উঠল সে। আমরা সরে গেলাম ওর কাছ থেকে। সেও আসতে চাইত না আমাদের কাছে, নীরবে চলে যেত পাশ কাটিয়ে। আর গালে মস্ত তিল-ওয়ালা নতুন ছেলেটা সামনে পড়লে সে প্রায় ছুটেই পালাত।

আমাদের শহরে বৃষ্টি নামে প্রায়ই। কখনো কখনো সারা দিন-রাত ধরে। সবাই তাতে এত অভ্যস্ত যে ভ্রূক্ষেপও করে না। বড়োরা ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটে। ছোটোরা এক-একটা ছুট দিয়ে যায় ফটকের এক খিলান থেকে আরেক খিলানে, লাফিয়ে যায় আঙিনার একটা পাথুরে দ্বীপ থেকে আরেকটায়।

জোর বৃষ্টি নেমেছিল সে সন্ধ্যায়। বইছিল হাড়-কাঁপানে বাতাস। লোকে বললে, শহরের কাছাকাছি কোথায় বান ডেকেছে। তাহলেও ফটকের খিলানের নিচে আমরা রইলাম ঘেঁষাঘেঁষি করে, বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হচ্ছিল না। সাত নম্বর ফ্ল্যাটের নিনকা কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল নতুন ছেলেটার জানলার নিচে। ওখানে ওর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার পড়ল কেন? ছেলেটার ওপর কি ও একচোট নেবে ভাবছে? নাকি ঠিক করেছে মনে মনে এক হাজার অবধি না গোনা পর্যন্ত বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকবে? অথবা দুই হাজার। পরনে তার অনেক আগেই খাটো-হয়ে-যাওয়া একটা কোট, মাথায় ওড়না নেই। সোজা সোজা চুলগুলো ভিজে লেপটে গেছে গালের সঙ্গে, তাতে লম্বা দেখাচ্ছে

মুখখানা। জমে-যাওয়া দু'বিন্দু জলের মতো জ্বল-জ্বল করছে চোখ। ঝম-ঝম করছে জল নামার পাইপগুলো, চড়বড় শব্দ হচ্ছে জানলায়, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে ছাতার



চাঁদোয়া। কিন্তু কিছুই দেখছে না নিনকা, কিছুই শুনছে না। টেরও পাচ্ছে না জলের ঠাণ্ডা ছাট। কী একটা মরিয়া সংকল্পে তন্ময় হয়ে সে দাঁড়িয়েই রইল জানলার নিচে।

ফটক থেকে আমরা ডাকলাম তাকে:

'নিনকা, এখানে চলে আয়! নিনকা!'

এল না সে। বৃষ্টির মধ্যে আমরাই ছুটে এসে তার হাত ধরলাম: মারা পড়বে যে!

'চলে যা বলছি!' স্রেফ খেঁকিয়েই উঠল আমাদের ওপর।

চলে এলাম আমরা। ওর দিকে পেছন ফিরে দেখতে লাগলাম রাস্তা। ছাতা মাথায় দিয়ে তাড়াতাড়ি করে হাঁটছে লোকে। মনে হয় যেন ভয়ঙ্কর সব কালো কালো প্যারাশুটে পুরো একদল সৈন্য নেমেছে শহরে।

পরে আমাদের চোখে পড়ল নিনকার মা এসেছে তার কাছে। অনেকখন ধরে মা তাকে চলে আসার জন্যে বোঝালে। শেষ পর্যন্ত তাকে বৃষ্টি থেকে নিয়ে গেল সদর দরজায়। মিটমিটে আলো জ্বলছিল। তার দিকে মুখ তুললে নিনকার মা, তাকে বলতে শুনলাম:

'চেয়ে দ্যাখ আমার দিকে। তুই কি ভাবিস, আমি সুন্দরী?'

অবাক হয়ে নিনকা তাকালে মায়ের দিকে, আর নিশ্চয় কিছুই সে দেখতে পেলে না। মা কি কখনো সুন্দরী হতে পারে, কিংবা অসুন্দরী?

'জানি না,' কবুল করলে নিনকা।

'এত দিনে তোর জানা উচিত ছিল,' রূঢ়ভাবে বললে নিনকার মা, 'আমি মোটেই সুন্দরী নই, স্রেফ কুৎসিত।'

'না, না!' বলে উঠল নিনকা।

মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে কেঁদে ফেললে। আমরা বুঝতে পারলাম না কার জন্যে ওর কষ্ট, মায়ের জন্যে না নিজের জন্যে।

'সেটা কী এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার? কিছুই না,' এবার শান্ত গলায় বললে নিনকার মা, 'কেবল সুন্দরীরাই সুখী হয় এমন নয়। অসুন্দরীরও বিয়ে হয়।'

'বিয়ে আমি করব না!' রেগে জবাব দিলে নিনকা। এ ব্যাপারে আমরাও ওর সঙ্গে একমত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই,' যেন সচেতন হয়ে উঠল মা, 'বিয়ে করতেই হবে এমন কী কথা আছে...'

তারপর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওরা চলে গেল রাস্তার দিকে। নিজেরা কোনো বলা-কওয়া না করেই আমরাও পিছু নিলাম, কৌতূহলের বশে আর কি। না, আমাদের মনে হল আমাদের হয়ত দরকার পড়বে নিনকার।

হঠাৎ আমাদের কানে এল নিনকা জিজ্ঞেস করছে:

'তোমার বর ছিল?'

'না।'

'কিন্তু আমার বাবা তো কেউ ছিল?'

মা জবাব দিলে না। যেন তার কানেই যায় নি প্রশ্নটা। রেগে গিয়ে নিনকা বেশ রূঢ়ভাবেই বললে:

'বলতে চাও আমায় বকের কাছ থেকে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ রে,' চাপা ফিস-ফিস করলে মা, 'বক উড়ে এল তোকে নিয়ে। তারপর উড়ে গেল। তুই রয়ে গেলি।'

যাচ্ছিল তারা অন্ধকার গলি দিয়ে, ছাতা ছিল না। কিন্তু কিছুই যেন তাতে এসে যায় না ওদের। বৃষ্টি পড়ছে, পড়ুক। অথচ ভেজা ঠাণ্ডায় কাঁপছিলাম আমরা।

'তার মানে বক আমার বাবা?' সামান্য হেসে বললে নিনকা, 'চমৎকার! আমি যখন মাস্টারনী হব, তখন আমায় লোকে ডাকবে নিঁনা বক-কন্যা। কে জানে, ডানাও গজাতে পারে আমার। তুমি যদি আমায় বাঁধাকপির মধ্যে কুড়িয়ে পেতে, তাহলে কত খারাপ হত দ্যাখো তো।'

'হাসি রাখ,' মা বললে।

'মোটেই আমি হাসছি না।' সত্যিই তখন আর হাসছিল না নিনকা, গলা ওর কাঁপছিল, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। 'কিন্তু কোথায় সে... বক?'

মা মুখ ঘুরিয়ে বৃষ্টির জল মুছে নিলে গাল থেকে।

'সেও দেখতে কুৎসিত ছিল?'

নিনকা থেমে গিয়ে জোরে মায়ের বাহুপাশ চেপে ধরে তাকালে তার মুখের দিকে। এমনভাবে সে মায়ের দিকে দেখছিল যেন কী একটা ভুল হয়ে গেছে, তার পাশে-পাশে যে হাঁটছে সে যেন তার মা নয়, অচেনা কোনো মেয়ে। মাকে যেন সে দেখছে এক ঠান্ডা নিষ্করুণ আয়নায়। ঠিক সে যেমনটি, তেমনি। বাড়ির অন্ধকার দেয়াল ঘেঁষে আমরা, পরের ছেলেমেয়েরা তাকে যেমন দেখছি। ওদের কাছ থেকে আমরা এত কাছে ছিলাম যে সাবান আর জীর্ণ পোষাকের গন্ধ পর্যন্ত টের পাচ্ছিলাম। আর আমাদের না দেখলেও সাত নম্বর ফ্ল্যাটের



নিনকা যেন আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েই একেবারেই অন্যরকম গলায় শান্তভাবে বললে:

'এসো মা, তোমার সঙ্গে রূপের ডালি খেলা খেলি।'

'ঢঙ রাখ!'

'না, না, মা, এসো খেলি। আমি তোমায় শিখিয়ে দেব। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনো আমি যা বলছি।'

আরো জোরে সে মায়ের হাত চেপে ধরে আস্তে-আস্তে শুধু ঠোঁট দিয়েই আমাদের খেলার সেই কথাগুলো বলতে লাগল, নতুন ছেলেটা আসার আগে যা আমরা তাকে শোনাতাম:

'মা, তোমার কী সুন্দর মরাল গ্রীবা, বড়ো বড়ো চোখ তোমার সাগরের মতো নীল। কী সুন্দর তোমার লম্বা সোনালী চুল, প্রবালের মতো ঠোঁট...'

অদৃশ্য মেঘ থেকে অঝোরে বৃষ্টি নামল। পায়ের তলে জেগে উঠল তুহিন সমুদ্র। শহরের সবকিছু লোহা আর টিন বাজছিল ঝম-ঝম শব্দে। কিন্তু বাতাসের গর্জন, শেষ হেমন্তের কনকনে শীত আর অন্ধকার ভেদ করে জীবন্ত উষ্ণ ধারায় বয়ে চলল দুঃখ-হরা কথার স্রোত:

'কী সুন্দর তোমার চিকন গা... বাঁকা ভুরু... মুক্তোর মতো দাঁত...'

গায়ে গা ঘেঁষে তারা এগিয়ে চলল সামনে। কথা আর কিছু বলছিল না। তারা তখন শান্ত হয়ে এসেছে। আমাদের বানানো খেলায় উপকার হয়েছে ওদের। এনা, বেনা, রেস... এর ওর আস্তিন ধরে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম দেয়াল ঘেঁষে, চেয়ে রইলাম অন্ধকার কুহেলীতে তারা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। কুইন্তের, কন্তের, জেস...

সাত নম্বর ফ্ল্যাটের নিনকা মারা যায় ১৯৪২ সালে মৃগার কাছে ফ্রণ্টে। নার্স ছিল সে।



পাশা সেদভের উত্তরাধিকার

পাইওনিয়র শিবিরের ব্র্যাস ব্যান্ড বাজিয়েদের মধ্যে পাশা সেদভ ছিল সবার ছোটো। কিন্তু তার ড্রামটি ছিল প্রকাণ্ড। এমনকি যে রামশিঙাটা তার পেতলের অজগর পাকে ঢ্যাঙা কারাভায়েভ'কে জড়াত, সেটাও হার মানত ড্রামের কাছে। কাঁধে তারপলিনের স্ট্র্যাপ গলিয়ে পাশা ঝুলিয়ে নিত ভারি ড্রামটা, ভারসাম্য রাখার জন্যে সামান্য পেছনে হেলতে হত তাকে। হাতে তার থাকত বিস্ময়চিহ্নের মতো হালকা সরু কাঠি নয়, ফেল্ট-মোড়া বাঁটুল লাগানো রীতিমতো বাজন-ডান্ডা। তা দিয়ে পাশা নিপুণ বোল তুলত, প্রকাণ্ড যন্ত্রটা দিয়ে তান ধরত ট্রাম্পেটের সঙ্গে। যে জানে না, তার কাছে মনে হবে ড্রাম বাজাতে সবাই পারে। একেবারে ভুল কথা! যে-স্বরলিপি দেখে পাশা বাজাত তাতে লেখা ছিল: 'ড্রামের পালা'। গোটা ব্যান্ডই চলত তার তালে তালে।

ড্রামটা পুরনো, রঙচটা, তোবড়ানো, মস্তো একটা কালচে তালিমারা। তার ধাতব পাতে সাবেকী ধাঁচের, আধো-মুছে যাওয়া হরফে লেখা ছিল 'বজ্র ঝাঁপে, দুনিয়া কাঁপে!' নিশ্চয় অদ্ভুত এই নীতিবাণীটায় বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে ড্রামের প্রাণটা বজ্রের।

হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল পাশার ড্রাম।

সাধারণত তা টাঙানো থাকত পাশার খাটের শিয়রে। দেয়ালে পোঁতা একটা মজবুত পেরেক থেকে। সবাই ঠাট্টা করত পাশাকে:

'দেখিস, খসে মাথায় না পড়ে!'

পাশা জানত যে পড়বে না। যখন বৃষ্টি নামত, বাজ ডেকে উঠত জানলার ওপাশে, ড্রাম তখন তাতে সাড়া দিত চাপা গুঞ্জন তুলে। রাত্রে ওটাকে দেখাত যেন ঝিকিমিকি চাঁদ, কেমন করে যেন তা নেমে এসেছে চতুর্থ দলের শোবার ঘরে, আটকে গেছে পাশা সেদভের শিয়রে।

রিহার্সালে যাবার সময় পাশা টুলে চেপে কুঁথে কুঁথে ড্রামটা নামাত দেয়াল থেকে। সাবধানে এগুত যাতে খাটের বাজুর সঙ্গে ওটার ধাক্কা না লাগে। কোনো দিন দেরি হয়ে গেলে যখন ছুটতে হত, তখন ড্রামের ভার পাশাকে ঠেলে সরিয়ে দিত এক-এক দিকে। ব্যান্ডে পাশা গিয়ে দাঁড়াত সবার শেষে। সেটা মাথায় সে সবার চেয়ে খাটো বলে নয় — স্রেফ এই জন্যে যে ড্রামের জায়গাটা সবার পেছনে, আর ট্রাম্পেটগুলো থাকার কথা সামনে, যদিও কোনো একটা ট্রাম্পেট, এমনকি সবকটা ট্রাম্পেট একসঙ্গে মিলেও চাপা দিতে পারত না ড্রামের ঢিপ স্পন্দন, তার জোরালো দরাজ বজ্রনাদ। বজ্র ঝাঁপে, দুনিয়া কাঁপে! ড্যাং! ড্যাং! ড্যাং! কদমে কদমে তাল দিত ড্রাম, ড্রাম-বাজিয়েকে কিন্তু দেখা যেত না। দূরে থেকে মনে হত, প্রকাণ্ড ড্রামটা যেন জীর্ণ জুতো পরা ছাল-ছড়ে-যাওয়া হাঁটু সমেত দুই পায়ে নিজেই হেঁটে যাচ্ছে...

কোথায় গেল ড্রামটা? দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ড্রামটা দিব্যি ঝুলে ছিল দেয়ালে, কিন্তু চতুর্থ দল যখন খাওয়া সেরে ফিরল, তখন আর ওটাকে দেখা গেল না। উঁচিয়ে ছিল শুধু পেরেকটা। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা নজরে পড়ে পাশার। তৎক্ষণাৎ সে খুঁজে দেখলে গোটা ঘরটা, উঁকি দিলে প্রতিটি খাটের নিচে, বার কয়েক গোটা



বাড়িটাও ঘুরে এল। এ তো আর খড়ের গাদায় সুঁই হারানো নয় — ড্রামের মতো একটা জিনিস।

পাশা ওটা সঙ্গে করে এনেছিল অনেক দূর থেকে। পাইওনিয়র শিবিরে এসে পৌঁছতে তার লেগেছিল পুরো তিনটে দিন। রেলের কামরায় ওটা রাখার মতো জায়গা মেলে নি। ফলে নিজের বাঙ্কের ওপরেই রেখে তাকে শুতে হয়েছিল বাকি জায়গাটুকুতে। ঘুমিয়েছেও সে ওইভাবে গুটিসুটি মেরে। গোটা পথটা সে বাঙ্ক ভাগাভাগি করে গেছে তার ড্রামটার সঙ্গে।

'লাগেজ-ওয়াগনে দিলেই পারতিস,' বলেছিল প্যাসেঞ্জাররা।

লাগেজ-ওয়াগন! বলে দেওয়া তো খুবই সোজা। আর যদি তা হাত থেকে পড়ে যায়, কিংবা মালপত্তর চাপিয়ে দেয় তার ওপর, থেবড়ে যায়? না বাপু, খুব হয়েছে! এ তো আর লটবহর ভরা ট্রাঙ্ক নয়, ব্যাণ্ডের যন্ত্র।

আর দেখুন, খোয়া গেল যন্ত্রটা।

সারা দিন পাশা খুঁজে বেড়ালে। গোটা শিবিরটাই সে ঘুরলে। উঁকি দিলে সবকটি আড়ালে-আবডালে। জিজ্ঞেস করলে সবাইকে:

'আচ্ছা, ড্রামটা দেখেছেন কোথাও?'

সবাই কাঁধ ঝাঁকালে। কেউ দেখে নি।

তাদের দলটা রাতের খাবার খেতে গেল, পাশা গেল না। বললে:

'ড্রামটা না পাওয়া পর্যন্ত খাব না।'

'সে কী, অনশন ধর্মঘট করবি নাকি?'

'না, অনশন ধর্মঘট নয়। তবে ড্রাম না পাওয়া পর্যন্ত খাব না।'

ড্রাম ছাড়া সেদিনকার ব্র্যাস ব্যাণ্ডে মার্চের অভ্যস্ত বাজনাটা কেমন এলিয়ে গেল। তাল কেটে কেটে বাজল ট্রাম্পেটগুলো, ঠিক প্রধান যন্ত্রটারই ফাঁক কিছুতে ভরল না।

'মন খারাপ করিস নে,' পাশাকে বললে পাইওনিয়র দলপতি কিম, 'নতুন ড্রাম তোকে আমরা কিনে দেব।'

'নতুন ড্রাম নিয়ে আমার কী হবে?' জবাব দিলে পাশা সেদভ, 'নতুন আমার দরকার নেই। এটা যে আমার উত্তরাধিকার।'

'উত্তরাধিকার... সে কী, জমিদার হয়ে উঠলি কবে?'

চুপ করে রইল পাশা। ভেতরে ঢুকে না খেয়েই শুয়ে পড়ল ঘুমতে।

আর সকালে ছেলেদের চোখে পড়ল এবার হারিয়ে গেছে পাশা সেদভ নিজেই। বিছানাটি ওর পরিপাটী করা গোছানো, শুধু পাশাই নেই। সকালের কুচকাওয়াজের সময় ঘোষণা করে হল যে প্রাতরাশের পর গোটা শিবিরই খুঁজতে বেরবে হারিয়ে-যাওয়া ড্রাম-বাজিয়েকে।

ফাঁকা হয়ে গেল শিবির। বেরল সবকটা দলই। সবাই পরিণত হল এক একটি গোয়েন্দায়। সবাই গালাগালি দিলে পাশাকে। গেল কোথায়? কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছে তার অদ্ভুত উত্তরাধিকারটা?

শিবিরে পাশা সেদভ যখন ফিরল তখন বহুক্ষণের নিষ্ফল তল্লাসিতে হয়রান হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফটক দিয়ে সে ঢুকল খোঁড়াতে খোঁড়াতে, চোখ বসে গেছে। চেহারাখানা যুদ্ধজয়ীর মতো, যেন ছাউনিতে ফিরছে লড়াই শেষে। কাঁধ থেকে ড্রামটা ঝুলছে এক মস্তো ঢালের মতো, বাজাবার ডান্ডাটা চেপে ধরেছে মুষলাস্ত্রের মতো। লম্বা পথ হেঁটে আসায় ড্রামের ভারে সে সামান্য দুলছে এপাশে-ওপাশে।

পাশাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল দলপতি কিম:

'পাওয়া গেল তাহলে!'

'পেয়েছি...' আস্তে জবাব দিলে পাশা।

'কোথায় ছিলি তুই?'পাশাকে নজর করে দেখে বললে কিম, 'গোটা শিবির এদিকে নেমে পড়েছিল, সর্বত্র খুঁজে বেড়ালে তোকে।'

'একটু খেতে পেলে হত,' বললে পাশা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। চল্ ক্যাণ্টিনে যাই। দে, আমি বইছি... ড্রামটা।'

'আমি নিজেই বইব,' দলপতির পেছু ধরতে ধরতে বললে পাশা, 'নিয়ে গিয়েছিল ওই... ক্লাবের ছেলেরা। তবে খুঁজে বার করলাম...'

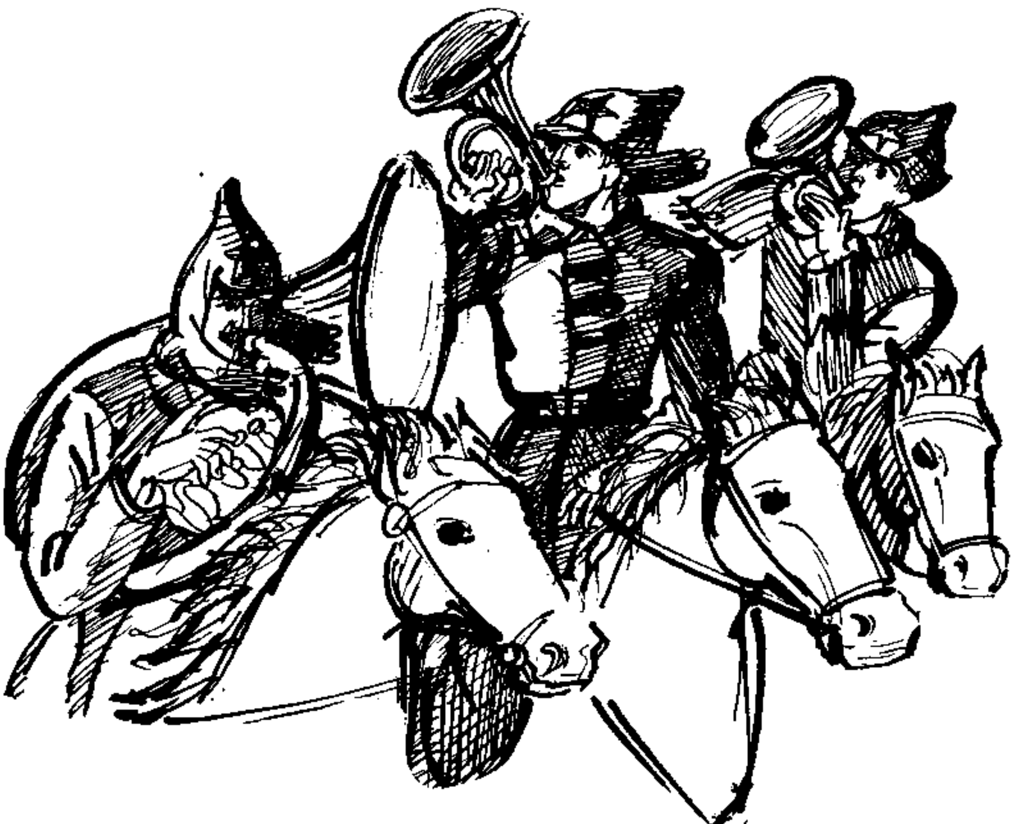
ফাঁকা ক্যাণ্টিনে ও ক্লান্তিতে চেয়ারে বসল, মেঝেতে ড্রামটা রাখল নিজের পাশেই, আর খাওয়ার গোটা সময়টা ধরে চেয়ে চেয়ে দেখল ওটাকে, যেন ভয় পাচ্ছিল

ড্রামটা বুঝি গড়িয়ে গিয়ে ফের হারিয়ে যাবে। জাউটা ছিল ঠান্ডা, কিন্তু ক্ষুধার্ত পাশা তা খেলে অবর্ণনীয় তৃপ্তির সঙ্গে।

দলপতি কিম ছিল তার সামনে বসে, কিছুই সে জিজ্ঞেস করলে না, বকলে না। তারপর পাশা যখন তার কম্পোট খাওয়া শেষ করে মুখ মুছলে হাত দিয়ে, দলপতি জিজ্ঞেস করলে:

'ড্রামটার ওপর তোর এত টান কেন বল তো?'

দলপতির দিকে পাশা সেদভ এমনভাবে তাকালে যেন তাকে এই প্রথম দেখছে। বললে:



'এটা দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচের ড্রাম। আমার পাশের ফ্ল্যাটের লোক এটা আমায় দিয়ে গেছেন। উত্তরাধিকার।'

দলপতি কিম কিছুই বুঝতে পারল না। পাশা সেদভ তাকে বুঝিয়ে বললে:

'দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচ বাজনা বাজাতেন। সে সময় শহর দখল করে শাদারা। ব্যান্ড-দলকে অফিসার 'জারকে বাঁচিও ভগবান' বাজাবার হুকুম দেয়। কিন্তু দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচ ছিলেন লালেদের পক্ষে। বাকি বাজিয়েরাও। তাদের ইচ্ছে ছিল না ভগবান জারকে বাঁচিয়ে রাখুক। তারা বাজালে: গড়ে যাব নিজেদের এক নয়া বিশ্ব, তারা হবে সবকিছু যারা ছিল নিঃস্ব!' গালাগালি দিলে অফিসারটা, হম্বিতম্বি করলে। শেষে হাঁকলে: মেসিনগান!' টেনে আনা হল মেসিনগান। ওরা কিন্তু বাজিয়েই চলল: 'আমাদের এই শেষ চূড়ান্ত যুদ্ধ!' ব্র্যাস ব্যান্ডের ড্রাম-বাজিয়ে দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচও বাজালেন: 'আমাদের এই শেষ চূড়ান্ত যুদ্ধ!' অফিসার হুকুম দিলে: 'ফায়ার!' গুলি চালালে লাল বাজিয়েদের ওপর।'

ড্রামটার দিকে চাইলে পাশা সেদভ, মস্তো কালচে তালিটার ওপর সে হাত বুলাল। বললে:

'এইখানটায় গুলি লেগেছিল।'

ক্যান্টিনটা একেবারে চুপচাপ। দলপতি কিম নিচু হয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ড্রামটা, দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচ যা লিখে গিয়েছিল সেটা পড়লে: 'বজ্র ঝাঁপে, দুনিয়া কাঁপে!' বাবুর্চিও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল পাশা সেদভের উত্তরাধিকারের দিকে।

'আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের লোকটি তখন ছিলেন ছোটো,' বললে পাশা, 'দ্‌মিত্রি ফিয়োদরোভিচকে তিনি চিনতেন। ড্রামটা তিনি কুড়িয়ে আনেন...'

'এটা মিউজিয়মে দেওয়া দরকার,' বললে দলপতি কিম।

'উঁহুঁ,' আপত্তি করলে পাশা, 'মিউজিয়মে ওটা চুপ করে থাকবে। আর এটার দরকার বাজা... বজ্র ডাকানো...'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল পাশা সেদভ। একটা খালি ডিশের পাশেই ছিল তার বাজন-ডান্ডা, তা দিয়ে সে হালকা ঘা দিলে ড্রামে। একটা গাঢ় চাপা আওয়াজ ভেসে গেল ক্যান্টিনে। আবার ঘা দিলে পাশা। আওয়াজ উঠল জোরে। হঠাৎ ছেলেটা ড্রাম

ঝোলালে কাঁধে, সামান্য পেছনে হেলে বাজন-ডাণ্ডা হাঁকাল। আর ব্র্যাস ব্যাণ্ডের বাজিয়েরা তখন অঘোরে ঘুমলেও, ট্রাম্পেট তাদের নীরব থাকলেও দলপতি কিম আর বাবুর্চি বেশ চিনতে পারলে পাশার বাজনাটা। বিশালে হৃদয় আর ছোটো ছোটো হাতে ধ্বনিত পরিচিত রণসঙ্গীতটা উঠতে লাগল ড্রামের গভীর থেকে। সংহত হয়ে উঠল সুরটা, ক্যাণ্টিনঘরটা পূর্ণ করে বাইরে ভেসে গেল এক প্রভাতী সঙ্কেতের মতো। এটা সেই সঙ্গীত যা মেসিনগানের অগ্নিবর্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে বাজিয়ে গিয়েছিলেন লাল বাজনদাররা, চান নি ভগবান জারকে বাঁচিয়ে রাখুক, নিজেদের নয়া বিশ্ব গড়ার জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন শেষ যুদ্ধে।



কোথায় আকাশের শুরু

ছেলেটাকে দেখি বৃষ্টির পর, রাস্তায়। হাঁটছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ছাল ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে রক্ত জমাট বেঁধেছে সীলমোহরের মতো। জীর্ণ চ্যাপটা স্যাণ্ডেল জোড়া দেখতে কাছিমের মতো। হাতে ওর একটা দড়ি, ধূসর রঙের একটা ন্যাকড়ার সঙ্গে তা বাঁধা। ভেজা অ্যাসফল্টের ওপর লোটাচ্ছিল ন্যাকড়াটা, বোঝা মুশকিল কোন কাজে ওটা লাগবে।

‘কী করবি এই ন্যাকড়াটা দিয়ে?’ জিজ্ঞেস করলাম ওর কাছে এসে।

‘ন্যাকড়া নয়,’ নিচু গলায় জবাব দিলে ছেলেটা, ‘এটা প্যারাশুট।’

'প্যারাশ্যুট?'

এবার ঠাহর করে দেখলাম ন্যাকড়াটা সত্যিই গম্বুজের মতো, দড়িটাও আসলে জড়ানো রশিগুচ্ছ। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম:

'তা ওটা জলের মধ্যে টানছিস যে?'

'এমনি...' অস্পষ্টে বলে চোখ তুললে আমার দিকে।

বড়ো বড়ো কালচে তার মণি। নির্মল ঝলক তাতে, বৃষ্টির পর পাতায়, চালে, রাস্তায় যে ধরনের ছটা দেখা যায়। শাদা অংশটা প্রায় দেখাই যায় না, চোখ ভরে কেবল মণিটা। আমায় চেয়ে চেয়ে দেখছে।

'ছাদ থেকে ছেড়েছিলি বুঝি?' ভেজা কাদা-ছিটকানো প্যারাশ্যুটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'উঁহুঁ, জানলা থেকে।'

'আর ভার কী চাপিয়েছিলি?'

'ভার?' ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে সে চাইলে আমার দিকে, 'আমি নিজেই... ঝাঁপ দিয়েছি।'

'প্যারাশ্যুটটা যে তোর পক্ষে খুবই ছোটো।'

'বড়ো আর পাব কোথায়?' এবার ও এমন ঠাট্টার দৃষ্টিতে চাইলে আমার দিকে যেন আমি নিতান্তই অবোধ, 'বিছানার চাদর দিয়ে বানালে পিট্টি খেতে হবে যে। আমি তো এই বালিশের ওয়াড়ের জন্যেই পিট্টি খেয়েছি...'

এবার নজরে পড়ল গম্বুজের ধারগুলোয় ভেজা ভেজা মিহি ফিতে। সত্যিই প্যারাশ্যুটটা ওয়াড় দিয়ে তৈরি, এক সময় সেটা শাদাও ছিল। আমার সমালোচনার দৃষ্টিটা ধরা পড়ল ওর চোখে।

'ছোটো প্যারাশ্যুটেও ঝাঁপ দেওয়া যায়... শুধু আকাশ থাকা চাই,' বললে ও নিজের প্যারাশ্যুটটির সমর্থনে।

'আকাশ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি যে নিচ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। সেখানে তো আর আকাশ নেই,' ব্যাখ্যা দিলে সে।

'আর পাঁচ তলায় আকাশ পাওয়া যাবে?'

‘এখনো... পাঁচ তলা থেকে ঝাঁপাই নি।’

জমাট, লালচে গালার মতো হাঁটুটার দিকে কটাক্ষে চাইতেই আমার গা ছম-ছম করে উঠল, অতল গহ্বরের ধারে কি উঁচু সাঁকোর রেলিঙের কাছে দাঁড়ালে যেমন হয়। মাথায় হাত দিলাম আমি, দেখলাম বড়ো বড়ো গাঢ় মণিদুটো আমার দিকেই চেয়ে আছে।

‘তুমি কখনো প্যারাশুটে ঝাঁপ দাও নি?’ জিজ্ঞেস করলে সে এমনভাবে যেন ও-আমি সমান।



'উঁহুঁ,' আমিও উত্তর দিলাম সমানে-সমানে। আমার এই ছোটো সহচরের কাছে কেমন যেন লজ্জাই হল। আর ওর চোখে মান আমার যাতে পুরো খোয়া না যায়, তাই বললাম, 'তোর মতো বয়সে ঝাঁপ দিয়েছি... ছাতা নিয়ে।'

'আমিও ছাতা নিয়ে দেখেছি,' বোদ্ধার মতো মাথা নাড়লে ছেলেটা, 'উল্টে গেল।'

মনে পড়ল আমার ঝাঁপটার ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল এবং আপন মনে খুশি হয়ে উঠলাম।

'যা বলেছিস! আমায় আবার চাঁটিও খেতে হয়েছিল ছাতাটার জন্যে।'

'চাঁটি তো সবকিছুর জন্যেই খেতে হয়,' বলে স্যাণ্ডেলের খস-খস শব্দ তুললে ছেলেটা।

খানিকক্ষণ আমরা চললাম চুপচাপ। আমার ছোট্ট প্যারাশুটিস্টটির শ্রেষ্ঠত্ব টের পাচ্ছিলাম, ভাবতে লাগলাম সেটা ও পাচ্ছে কোত্থেকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যত অসংখ্য ভয় মানুষকে পেয়ে বসে তা থেকে ও মুক্ত বলেই কি? বোধ হয় পা চালিয়েছিলাম একটু বেশি তাড়াতাড়ি, কেননা পেছন থেকে শোনা গেল সেই পরিচিত নিচু গলা:

'অত জোরে যেও না।'

'কেন, পা ব্যথা করছে?'

'না, স্যাণ্ডেল খুলে যাচ্ছে।'

ফিরে চাইলাম আমি। অ্যাসফল্টে দাঁড়িয়ে সে খুলে ফেলছে তার চ্যাপটা ভেজা স্যাণ্ডেলটা। ছেলেটার হাতে গিয়ে ওটাকে আরো বেশি দেখাল কাছিমের খোলার মতো।

'পরে নে।'

'এই বেশ ভালো,' বলে দ্বিতীয় পাটিটাও সে খুলে নিলে।

ছেঁড়া ছেঁড়া শীর্ণ মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলে সূর্য। রোদ উঠল কড়া, অ্যাসফল্টের ওপর ভেসে উঠল তপ্ত নীলাভ ভাপ। ভাপ-ওঠা তপ্ত অ্যাসফল্টের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটা নিশ্চয় খুব আরামের। কিন্তু আমার পায়ে জুতো। আমার ছোট্ট সহচর আগের মতোই টেনে চলেছে ওয়াড়ের প্যারাশুটটা।

'কী করবি ভাবছিস?' প্যারাশুটটার দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি।

'আবার ঝাঁপাব... তবে আকাশে না হলে ওটায় কাজ দেয় না।'

'কিন্তু কোথায় আকাশ পাওয়া যাবে?'

জবাব দিলে না সে। মাথা তুলে তাকালে ওপরে। গভীর নীল আকাশ। যেন স্রোত বইছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছে তাতে। মেঘগুলো দেখতে লাগল



ছেলেটা, দৃষ্টি ওর বুলিয়ে নিলে উঁচু উঁচু পাইন গাছের ডগায়, ছাদের চুড়োয়। ক্রমাগত নিচে নামতে নামতে চোখ ওর থেমে গেল ছোট্ট প্যারাশুটটায়।

নিচু হয়ে ছেলেটা তুলে নিলে কাদামাখা প্যারাশুটটা। মোচড়ালে সেটাকে,

ঘোলাটে জল ঝরে পড়ল অ্যাসফল্টে। নিঙড়ালে, যেভাবে লোকে নিঙড়ায় শার্ট কি ইজের। তারপর কাঁধে চাপালে। এতে বোঝা গেল যে সব এখনো খোয়া যায় নি, এখনো কাজ দেবে ওয়াড় দিয়ে বানানো প্যারাশুট।

'আসি,' বলে ও দ্রুত উল্টো পথ ধরলে।

এমন একটা দৃঢ় সংকল্প ফুটে উঠেছিল ওর ভাবভঙ্গিতে যে আমার দুশ্চিন্তাই হল: উঁচু কোনো ছাদে গিয়ে উঠবে না তো? যে-প্যারাশুট কাজ দেয় কেবল আকাশে সেটা আর একবার পরখ করার জন্যে সেখান থেকে লাফ দেবে না তো নিচে?

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া!' চেঁচিয়ে ডাকলাম আমি।

অনিচ্ছায় থামল ও।

'যাচ্ছিস কোথায়?'

আমার গলার স্বরের উদ্বেগ ও টের পেয়েছিল, কিন্তু কেয়ার করলে না:

'সময় নেই আমার। ইগরক অপেক্ষা করছে।'

'আর লাফ দিবি না তো... ছাদ থেকে?'

'প্যারাশুট যে ভেজা।'

ও টের পেলে যে আমি ভয় পাচ্ছি। ওর মাথায় ঢোকে নি যে আমি ভয় পাচ্ছি ওর জন্যে। ও ধরে নিলে আমি স্রেফ ভীরু। বিদ্রূপে চোখের মণি কুঁচকে গিয়ে তা আরো জ্বল-জ্বল করে উঠল।

হঠাৎ টের পেয়ে গেলাম কোথা থেকে শুরু হয় আকাশ। ছাদের চুড়ো থেকে নয়, মেঘ-ভাসা নীল স্রোতটায় নয়। শুরুটা তার একেবারে মাটির কাছে. নিচ তলার জানলায় কিংবা কাঁধ-সমান উঁচু থেকে। নির্ভীক বুকের মধ্যে শুরু হয়ে তা প্রসারিত হয়ে যায় মেঘ কি নক্ষত্র পর্যন্ত, বুক তাকে যেখানে তুলে দেবে, সেখানে।

'ইগরক বসে আছে। চলি, কেমন?'

অধীরভাবে ও হাঁটু চুলকালে, কনুই দিয়ে চেপে ধরল স্যান্ডেল জোড়া।

মাথা নাড়লাম আমি। শুকিয়ে-ওঠা ছোপ-ছোপ অ্যাসফল্টের ওপর দিয়ে পা চালাল সে, নীলাভ ভাপ উঠছে যেখানে। নীরবে তার পেছু নিলাম আমি, ভালো করে জেনে নেব কোথায় আকাশের শুরু।



রুটির ফুল

ছোট্ট কলিয়ার যতদূর মনে পড়ে, যুদ্ধের দিনগুলোয় তার কেবলি ক্ষিদে পেত। ক্ষিদে সে কিছুতেই সইতে পারত না, মানিয়ে নিতে পারত না, রাগের ঝলক ফুটত তার কোটরে ঢোকা চোখে, অনবরত খাবার খুঁজে বেড়াত। না-ছাঁটা এলোমেলো কালো কালো চুল আর খোঁচা খোঁচা পাঁজরায় তাকে দেখাত যেন ছোট্ট রোগাটে এক নেকড়েছানা। খাওয়ার মতো কিছু একটা পেলেই সে তা মুখে তুলত — সরেল,

মুখ আটকে আসা বৈঁচি, বার্ড-চেরি, কী সব শিকড়বাকড়, অসহ্য টক আর শক্ত বুনো আপেল। বাড়িতে সে পেত জলের মতো কিছু ঝোল আর রুটি। ঝাড়াই-করা জোয়ারের গুছি গুঁড়ো করে মা মেশাত ময়দার সঙ্গে, ফলে রুটি হত ভারি, চ্যাটচেটে, সোঁদা সোঁদা কাদাটে গন্ধ উঠত। কিন্তু এ রুটিও কলিয়া দেখতে না দেখতে খেয়ে নিত, নাক ফুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করত লোভীর মতো।

সারা যুদ্ধের মধ্যে একবার সে রুটি খেয়েছিল পেট পুরে। সে রুটি জোয়ার গুছির গুঁড়োয় নয়, সত্যিকারের। তা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সৈন্যরা। কুটিরে তারা ঢোকে রাত্তিরে। তাদের ভারি গ্রেটকোট আর জীর্ণ হাই বুটে শাদামতো কী একটা জিনিসের প্রলেপ, আধা-অন্ধকারে চিক-চিক করছিল তা, মনে হয় যেন তুষার-কণা লেগে আছে। অথচ বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। স্তেপ থেকে তারা আসে নি, নেমে এসেছে খড়ি পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে। উৎরাই-টা বেশ কঠিন, তাই খড়িমাখা হয়ে গেছে। গরম ঘরখানায় ওদের গা থেকে ভাপ উঠছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেল তামাকের ধোঁয়া, ভেজা পা-পটি, চামড়ার বেল্ট আর রাইয়ের টাটকা চাপাটির চড়া গন্ধে। চাপাটিগুলো তারা রেখেছিল টেবিলের ওপর।

অতিথি আগমনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছিল ঘরে, যেন রেলের স্টেশন, ছোট্ট কলিয়ার অস্বস্তি লাগছিল। এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে সে শঙ্কিতভাবে তাকিয়ে দেখছিল আগন্তুকদের। এই সময়ে বাঁ পায়ে খুঁড়িয়ে-চলা গাল-উঁচু এক সৈন্যের চোখে পড়ে যায় সে। হাতছানি দিয়ে কলিয়াকে ডাকে নিজের কাছে:

'ওহে কর্তা, আয় এখানে। রুটি খাবি?'

কলিয়ার ইচ্ছে হয়েছিল চেঁচিয়ে ওঠে: 'খাবো!- খাবো!' কিন্তু গলায় ওর দলা পাকিয়ে উঠল। একটা কথাও বলতে পারল না সে, শুধু চুপ করে লালা গিলতে লাগল।

'পেট পুরে খেঁট দিয়েছিস বুঝি?'

অসহায়ের মতো চোখ পিট-পিট করলে কলিয়া আর গাল-উঁচু সৈন্যটি তার থলে খুলে তার হাতে গুঁজে দিলে মস্তো এক টুকরো রুটি। মাথা ঘুরে উঠল ক্ষুধিত ছেলেটির। খচমচ করে সে উঠে পড়ল চুল্লির ওপরকার মাচায়, জড়িয়ে ধরলে রুটিটা। রুটির গন্ধ নিলে সে, আদর করলে, হাত আর গালে চেপে গরম করে তুলল সেটা।

কখনো সে কামড় দেয় তার শাঁসে, কখনো বা উত্তেজিত আহ্লাদে চিবিয়ে যায় তার চটা, সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে একটা শান্ত পরিতৃপ্তি। রুটিতে তার মন ভিজে উঠল যেভাবে মাঝে মাঝে বড়োরা দিলখুশ হয়ে ওঠে নেশায়। মনে হল তার, চারিপাশের সবকিছুই যেন রুটি-ময়: শুয়ে আছে সে রুটির ওপর, মাথার নিচে নরম রুটি, গা-ঢাকা দিয়ে আছে গরম রুটিতে। ঘুমিয়ে পড়ল সে। আর সারা রাতই কেবল স্বপ্ন দেখল রুটির।

...যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে, মা তখন তাদের ঘরোয়া ক্ষেতের এক ফালি মাটিতে গম বোনে। অচিরেই মাটি ফুঁড়ে মাথা তুললে ভীরু-ভীরু অংকুর। দেখতে ঘাসের মতো। সে ঘাস চিবিয়ে দেখল কলিয়া — মোটেই তাতে রুটির স্বাদ নেই, ঘাস যেমন হয় তেমনি। আদপেই হয়ত কোনো রুটি হবে না এতে। কিন্তু শিগগিরই ঘাসগুলো নলের মতো হয়ে উঠল।

'এবার মঞ্জরী ধরবে,' বললে মা।

দিন গুণতে লাগল সবাই, কলিয়াও; মনে পড়ত তার সেই টাটকা চাপাটি আর রুটি-ময় সেই রাতটার কথা, যা হয়ত বা বাস্তব, হয়ত স্বপ্ন। কলিয়া ভাবত নীল-নীল ফুল কিংবা আলতা রঙের মুকুল ফুটবে তাতে। অথবা চেরি গাছের মতো ছেয়ে যাবে শাদা শাদা গুচ্ছে। কী ভাবে ফুল ফুটল সেটা কিন্তু তার চোখেই পড়ল না — দেখা দিল বড়ো বড়ো দানার মঞ্জরী, একটু নীলচে, ভেজা-ভেজা। তারপর জায়গাটা হয়ে উঠল খড়-রঙা।

প্রথম ফসল ওঠার আনন্দে দিদিমা প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুলের মতো দুটি চাপাটি বানালে। লালচে-লালচে রঙ, ঝলমলে তার গন্ধ। মাখনের প্রলেপ দিয়ে দিদিমা ভাঙা কাঁচের মতো বড়ো বড়ো নুন ছিটিয়ে দিলে তাতে। ভাপ উঠছিল চাপাটি থেকে, জ্বল-জ্বল করছিল যেন দুটি ছোট্ট নোনতা সূর্য।

টেবিলের কাছে বসে ছিল কলিয়া, খালে ঢোকা চোখ তার চাপাটি দুটোর ওপর নিবদ্ধ। অপেক্ষা করছিল কখন ওকে খেতে দেবে, বুক ভরে টানছিল সেঁকা রুটির তপ্ত গন্ধ। প্রাণপণে সে ঠেকালে যাতে হাত না বাড়ায়, ঈর্ষণীয় খাদ্যটা সে না নেয় বিনা অনুমতিতে। শেষ পর্যন্ত দিদিমা এসে বললে:

'নে বাছা, খেয়ে দেখ্ আমার চাপাটি।'

কোন একটা গোপন স্প্রীঙ যেন কাজ করে গেল তার মধ্যে, নিমেষে হাত এগিয়ে গেল রুটির দিকে, আঙুলগুলো সজোরে তা চেপে টেনে আনল মুখের কাছে। ঠোঁটে ছ্যাঁকা লাগছিল, জিভ পুড়ে যাচ্ছিল নুনে, রুচিকর গন্ধটা যাতে ফসকে না যায়, তার জন্যে স্ফীত হয়ে উঠল নাকের ফুটো। না, সৈনিকের রুটির চেয়েও চাপাটিটা খেতে অনেক ভালো, কিন্তু মুখের মধ্যে তা মিলিয়ে যেতে লাগল খুবই চটপট, শিগগিরই



কলিয়ার হাতে রইল কেবল সরু একফালি চাঁদের মতো। অচিরেই সেটাও আর রইল না... ঠোঁট চাটলে কলিয়া, আঙুলগুলো চাটলে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আর লালচে, অটুট, হয়ত-বা আরো বেশি সুস্বাদু দ্বিতীয় চাপাটিটা কিন্তু তখনো টেবিলেই, সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তা ডাক দিচ্ছে।

'এই চাপাটিটা নিয়ে যা দাদুর জন্যে,' বললে দিদিমা।

'বেশ, নিয়ে যাচ্ছি,' দমে-যাওয়া গলায় বললে কলিয়া।

দাদু খুবই বুড়ো, থাকে মৌমাছি খামারে। বাড়ি আসে সে কালে-ভদ্রে, যখন সব্জী-ভুঁইয়ে গরম করা হয় ঝুলকালিমাখা, বেঁকে-যাওয়া, স্নানের চালাঘরটা। সারা মুখে তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, যেন থুতনি থেকে গাল পর্যন্ত উঁচিয়ে আছে অসংখ্য লোহার পেরেক। কলিয়া তার কাছে ঘেঁষতে ভয় পেত, খোঁচা লাগবে বলে।

গরম চাপাটিটা দিদিমা চওড়া বার্ডক পাতায় মুড়ে এগিয়ে দিলে কলিয়ার দিকে। এই অমূল্য সম্পদটি কলিয়া প্রথমে হাতে করেই নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর পাতাটা ফেলে দিয়ে চাপাটিটা লুকিয়ে রাখতে হল কামিজের ভেতর যাতে ছেলে-পিলেরা কেড়ে না নেয়। চাপাটিটা গরম, চামড়ায় ছ্যাঁকা লাগছিল, ছ্যাঁকা-খাওয়া জায়গাটা জ্বলছিল বড়ো বড়ো নুনের দানায়। কলিয়ার মনে হচ্ছিল কোনো এক হিংস্র জন্তুর বাচ্চা সে নিয়ে যাচ্ছে কোলে করে, বাচ্চাটা কামড়াচ্ছে তার পেটে। কিন্তু সহ্য করে গেল কলিয়া। ছেলেগুলোর পাশ দিয়েই গেল, কী চমৎকার খাবার তার জামার তলে লুকনো, সেটা তারা সন্দেহও করলে না।

নাতির আসার শব্দ দাদুর কানে যায় নি। মৌমাছিদের জল খাওয়ানোর জায়গায় যেখানে নালা দিয়ে জল বইছে, তার সামনে বসে ছিল সে। নালাটায় গিজ-গিজ করছে মৌমাছি, ঠাণ্ডা জলে শুঁড় নামিয়ে জল খাচ্ছে। হাত পাতলে দাদু নালায়, জল গড়িয়ে এল তার অঞ্জলিতে, হাত ভরে সে মৌমাছিদের জল তুললে মুখে — সে জল মধুতে মিষ্টি-মিষ্টি। মৌমাছিরা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিল দাদুর কাঁধে, মাথায়, ঢুকে পড়ছিল কানের ফুটোয়, কিন্তু কামড়াচ্ছিল না। দাদুকে ওরা জানে ওদেরই একজন বলে।

খুশি হয়ে উঠল দাদু। চাপাটিটা হাতে নাড়াচাড়া করে সে তার গন্ধ শুঁকলে। আর বুড়োর সামনে কলিয়া দাঁড়িয়ে রইল বুক-ভরা এই আশা নিয়ে যে দাদু আধা-আধি ভাগ করবে চাপাটিটা।

'খাসা চাপাটি,' বললে দাদু।

'ভারি সুন্দর,' চট করেই সায় দিলে কলিয়া।

'জার্মানরা সরে যেতেই মাটিও ভালো ফলন দিচ্ছে!' রুটি-ধরা হাতটা নামালে দাদু, 'আর তোর দিদিমা আছে কেমন? হেঁটে-হুঁটে বেড়াচ্ছে?'

'বেড়াচ্ছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে কলিয়া, আর চাপাটির কথা যাতে বেশি ভাবতে না

হয়, তাই জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা দাদু, জার্মানদের সঙ্গে তুমি যে লড়লে, তার জন্যে তোমায় মেডেল দেবে?'

'মেডেলের কী দরকার?' বললে দাদু, 'তবিয়ৎ বহাল থাকলেই আমার হল।'

চাপাটিটা দাদু খেলে না, নিয়ে গেল তার চালাটায়। ইস্, কী লোভী দাদুটা! ওর ওই মৌমাছিগুলোর সঙ্গে থেকে থেকে একেবারে বুনো হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করেই চাপাটি লুকিয়ে রাখল ভাগ দিতে যাতে না হয়, পরে নিশ্চিন্তে মধু মাখিয়ে চিবুবে।

ফিরে আসছিল কলিয়া। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দাদু যখন নোংরা জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দিদিমাকে বলিস কেচে দিতে!' — তখন কেমন যেন চমকে উঠল কলিয়া, আর একটু হলেই দাদুর কাছ থেকে এক টুকরো চাপাটি চেয়ে বসত সে। কিন্তু মুহূর্তের দুর্বলতাটা সে জয় করলে। কোনো কথা বললে না।

বাড়ি ফিরল ধীরে সুস্থে, পোঁটলাটা দোলাতে দোলাতে, ভাবছিল যুদ্ধ যখন শেষ হবে, বাড়িতে ময়দা থাকবে অনেক, তখন সকাল দুপুর সন্ধে — সবসময়ই চাপাটি খাবে সে। এখন চাপাটিটা খাচ্ছে দাদুই, কলিয়াও তো তার নিজেরটা খেয়েছে। দাদুর ছবিটা ভেসে উঠল কলিয়ার সামনে: ফোকলা মুখে বহুক্ষণ ধরে চিবিয়েই চলেছে সেঁকা চটাটা। বুড়ো তো, নিশ্চয় স্বাদও কিছু টের পায় না।

বাড়িতে পুঁটলিটা দিদিমাকে দিয়ে গজ-গজ করলে:

'দাদু কেচে দেবার জন্যে দিয়েছে!'

'আছে কেমন সে? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?' শঙ্কিত হয়ে উঠল দিদিমা।

'অসুখ করবার কী আছে?' বললে কলিয়া, 'মৌমাছি পালছে।'

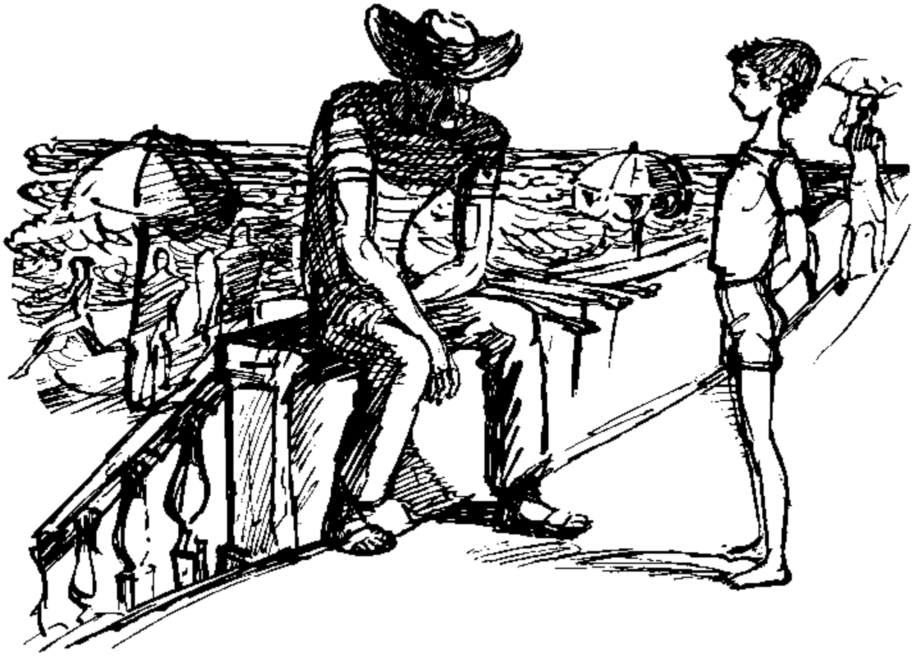
চুপ করে দিদিমা ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো বের করে রাখতে লাগল মাচায়, দেখতে লাগল কোথায় রিপু করতে হবে, কোথায় মারতে হবে তালি। পুঁটলির তলায় দেখা গেল পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধা একটা মোড়ক। অবাধ্য আঙুলে দিদিমা ধীরে সুস্থে খুললে মোড়কটা। ন্যাকড়ায় দেখা গেল সেই চাপাটিটা। কিছুই বললে না সে। অপ্রত্যাশিত খাদ্যটা সে রাখলে নাতির সামনে।

ঘন করে নুন ছিটানো লালচে সূর্যটায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল কলিয়ার। চোখে ওর ঝিলিক দিলে আনন্দের ছটা। স্বাদটা মনে হতেই মুখ ওর লালায় ভরে উঠল, হাত

বাড়িয়ে দিলে চাপাটির দিকে। কিন্তু কী একটা অচেনা হৃদয়াবেগে হাত ওর থেমে গেল। দেখা গেল সেটা ক্ষিদের চেয়েও জোরালো, রুটির চেয়েও জরুরী। তার মানে দাদু চিবোয় নি চাপাটিটা, মধু মাখায় নি, খেয়েছে শুধু ঐ মিষ্টি-মিষ্টি জল, ক্ষিদে যাতে মরে আসে, আর মৌমাছিগুলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে তার কাঁধে... আর ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে, কিন্তু মেডেল সে চায় না...

বেঞ্চি থেকে নেমে চলে গেল কালিয়া... কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বাড়ি ফিরে এল সে। ঠাণ্ডা চাপাটিটা সে টেবিল থেকে নিয়ে পরিপাটী করে মুড়লে পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে। তারপর দাদুর যে-বাক্সটায় থাকে তার পুরনো হাই বুট, টুপি, ঘরোয়া তামাকের বটুয়া, আর গত যুদ্ধের সঙীন, সেইখানে তা রেখে দিলে।





কিজিল কাঠের ছড়ি

সে গ্রীষ্মে গরম একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দিনের গরমের পর আসে সাঁঝের গরম, সাঁঝের পর রাতের। শুধু ভোরের দিকেই একটু তাজা আমেজ আসে সমুদ্র থেকে। কিন্তু এই ক্ষীণ শীতলতাটুকুও টেকে বেশিক্ষণ নয়। আর তাপ ছড়ায় কেবল সূর্যই নয়। পাথর, বালি, এমনকি গাছের পাতা থেকেও চুইয়ে পড়ে গরম। মাথার ওপর আলস্যে ভাসা বিরল দু' একটি মেঘ দেখে আর তুষারের কথা মনেও পড়ে না। এমন গরমে আদৌ কল্পনা করাই অসম্ভব যে দুনিয়ার কোথাও আছে তুষার-কণা, বরফ, ঠাণ্ডা।

সমুদ্রতীরের এই বসতটায় নিথর হয়ে গেল জীবন। লোকে হাঁটে গা-ছাড়াভাবে, নেতিয়ে পড়ে, রোদে বেরতে ভয় পায়। এমনকি ঝানু পুলিন-বিলাসীরাও হামলা সইতে না পেরে ঠাঁই নিয়েছে ছায়ায়।

কিজিল কাঠের ছড়ি-বেচিয়ে বুড়োটাই কেবল এই তপ্ত সূর্যকে ত্যাগ করে নি। বসত সে ঠিক জলের কিনারায় নয়, একটু দূরে, পাথরের নিচু বাঁধটায়। ছায়া খুঁজত না সে, নিজের সমস্ত ভাবভঙ্গি দিয়ে যেন চ্যালেঞ্জ করত দুপুরের ঝাঁঝকে। দেখতে রোগা, বেঁটে, পোড়া মাটির মতো গায়ের রঙ। মুখের অসংখ্য বলিরেখাগুলোকে মনে হত রোদ-পোড়া ক্ষেতের ফাটল। মাথার ছোটো ছোটো পাকা চুলগুলোকে লাগত নুনের মতো।

বুড়োর পাশে কিজিল কাঠের তিনটে টাটকা ছড়ি। বোঝা যায়, তাদের ঘষা-মাজার কাজ শেষ হয়েছে অতি সম্প্রতি, এখনো হলদে হয়ে ওঠার ফুরসুত পায় নি। মসৃণ, মজবুত, ওজনদার ছড়ি, ফলাও করে বাঁকানো হাতল। দূর ভ্রমণে খুবই উপযুক্ত। কালক্রমে তাতে হাতির দাঁতের রঙ ধরবে, দেখাবে ভারিক্কী, বনেদী।

দুঃখের বিষয়, কিজিল কাঠের ছড়ির মর্ম সবাই বোঝে না। তাই বুড়োর বেসাতির জন্যে চাহিদা ছিল কম। খামোকাই সে বসে থাকত তপ্ত পাথরে, লোকেরা চেয়েও দেখত না। যে-কোনো একটা শিলাখণ্ড কি শুকনো গাছের মতো চোখ-সহা হয়ে গিয়েছিল সে।

এমনি একটা দিনে একবার বুড়োর কাছে দাঁড়াল মস্তো শাদা পানামা-হ্যাট পরা একটি ছেলে। ভারি রোগা সে, লিকলিকে হাত, লম্বা গলা। টুপিটা ওর পক্ষে বেশ বড়ো, কান পর্যন্ত ঢেকে গেছে।

ছেলেটা যে এখানকার বাসিন্দা নয়, দক্ষিণী এই বসতটায় নিতান্ত নবাগত, সেটা নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায় তার গায়ের ঈষৎ গোলাপী রঙ দেখে, এখনো তা রোদ-পোড়া হয়ে ওঠে নি। বুড়োর সামনে জেগে উঠল শাদা টুপিটা — ছড়িগুলো দেখতে লাগল ছেলেটা। হাতের মুঠোয় ওর টাকা ছিল, কিন্তু ছড়ি কেনাটা ওর পরিকল্পনায় ছিল না। এমন আত্মসম্মানী ছেলে কে আছে যে লাঠির জন্যে পয়সা খরচ করবে, সে তো গাছ থেকে কেটে নেওয়া বা অন্য কোনো উপায়ে সংগ্রহ করা খুবই সম্ভব! কিন্তু কিজিল কাঠের ছড়িগুলো খুবই অসাধারণ। সাধারণ লাঠির তুলনায় তাদের রঙ চেহারার পার্থক্য ছাড়াও আরো একটা পার্থক্য এই ছিল যে এগুলোর জন্যে দাম দিতে হয়।

'কত করে?' জিজ্ঞেস করলে শাদা-টুপি-পরা ছেলেটা।

'এক-এক আধুলি,' গা-ছাড়াভাবে জবাব দিলে বুড়ো। ছেলেটার ধারণা হল নিজের মাল বেচার জন্যে বুড়োর মোটেই কোনো চাড় নেই।

বুড়োর গোটা মুখ-ভর্তি ছোটো ছোটো ফাটল, তার মধ্যে দুটো ফাটল অন্যগুলোর চেয়ে বড়ো: তার ভেতর থেকে বুড়োর চোখ নির্বিকারভাবে ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে ফের ফাটলে সেঁধাল। ছেলেটা চলে গেল আইসক্রীম কিনতে।

এখানে ছেলেটা উঠেছিল তার বাবার পরিচিতদের এক বাড়িতে। এ পরিচিতরা কেমন লোক, সেটা সে ঠাহর করতে পারে কেবল আসার দু'দিন পরে। পরিচিত এই লোকটি ছিল বেশ মোটা, কিন্তু আশ্চর্য চটপটে। হাঁটে, খায়, কথা বলে সবই খুব তাড়াতাড়ি। তাছাড়া মেজাজও তার তাড়াতাড়ি বদলায়। প্রথম দিনে সে অতিথিকে বরণ করে সোরগোল তুলে, উল্লাস করে, যেন এতদিন সে কেবল ওর আসার পথ চেয়েই বসেছিল, এবার ছেলেটির একটু মুখের কথা খসামাত্র সে তার জন্যে সবকিছু করে দেবে। কিন্তু পরের দিন সে ছেলেটাকে চেয়েও দেখলে না, নিজের কাজ নিয়েই রইল, সর্বদাই যেন তার কী একটা তাড়া। গৃহকর্ত্রী, পরিচিতের স্ত্রী চুপচাপ, নিরুচ্ছ্বাস মানুষ।

'এখানে ঘুমাবি। দুপুরের খাওয়া দু'টোর সময়। সাতটায় রাতের খাওয়া। আর প্রাতরাশ আমরা করি সকাল-সকাল,' ছোট্ট অতিথিকে এই কথাটুকু জানিয়ে সে চুপ করে যায়।

পানামা-পরা ছেলেটিকে কেউ কিছু করার অনুমতিও দেয় নি, নিষেধও করে নি। যা মর্জি হত সবই সে করতে পারত। যখন সে সমুদ্র-স্নান করলে কেউ ধমক দিল না: 'নে হয়েছে!' 'উঠে আয়!' সেও উঠে আসে নি।

তারপর ওর ইচ্ছে হল পাহাড়ে যাবে। মনে হয়েছিল, পাহাড় বুঝি এই হাতের নাগালে, আসলে হাঁটতে হয়েছিল অনেক। সমুদ্রতীর থেকে যা মনে হয়েছিল পাহাড়ের গায়ে ঘাস, দেখা গেল তা আসলে বড়ো বড়ো গাছ — পাহাড়ী বন, ঘন, দুর্ভেদ্য, খোঁচা-খোঁচা। আঁকাবাঁকা পাথুরে হাঁটাপথ দিয়ে উঠে যায় ছেলেটা, তৃপ্ত করে শরীর জুড়িয়ে নেয়।

ডাল ভাঙার শব্দ কানে আসে ছেলেটার। সতর্ক হয়ে জড়াজড়ি ডালপালা-গুলোকে সরাতে সরাতে সে শব্দটার অনুসরণ করে। দেখতে পেলে সেই বুড়োটাকে,

সমুদ্রতীরে যে কিজিল কাঠের ছড়ি বেচে। একটা ঢিবিতে উঠে বুড়ো সরু একটা চারা কাটছিল। কিন্তু পারছিল না। সশব্দে দম নিয়ে বুড়ো ফের কাজে নামছিল। অস্ফুট খ্যাক-খ্যাক শব্দ করে মৃদু কোঁথাচ্ছিল:

'আঁহ্... আঁহ্...'

ডালপালার মধ্যে থেমে গেল শাদা টুপিটা। গাছটা কি অতই শক্ত যে বুড়ো কাবু করতে পারছে না? নাকি বুড়োই অত দুর্বল? তার পিঠটা দেখতে পাচ্ছিল ছেলেটা: বাঁকা, পরিশ্রান্ত। পিঠের শার্টটা ঘামে ভেজা।

'আঁহ্... আঁহ্...' ভেসে আসছিল জায়গাটা থেকে।

ছেলেটার মনে হল এই বুঝি বুড়োর কিছু একটা ছিঁড়ে যাবে, ফেটে যাবে, ভেঙে পড়বে। খয়েরী রঙের গলায় ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সমস্ত বলিরেখাগুলো জ্বল-জ্বল করছে যেন শিশির-ভেজা।

অনেক মেহনত করতে হল বুড়োকে। শেষ পর্যন্ত কাটা গেল গাছটা। হয়রান হয়ে মাটিতে বসে পড়ে সে চোখ বুজলে।

সন্ধ্যার দিকে শাদা-টুপি ছেলেটা যখন সমুদ্রতীরে দেখা দিল, বুড়ো তখন বসে ছিল তার বরাবরের জায়গাটিতে। সামনে তার নুড়ির ওপর কিজিল কাঠের দুটি টাটকা ছড়ি। কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে লোক, বুড়ো বা তার বেসাতির দিকে কেউ তাকিয়েও দেখছে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা দেখতে লাগল কেউ ওর ছড়ি কেনে কিনা। যেন বুড়োর সুকঠিন ভাগ্যের খানিকটা ভাগ নিতে চাইল সে। বাঁধের ওপর বুড়োর নিশ্চল মূর্তিটার দিকে তাকাল সে, মনে পড়ে গেল কী ভাবে ওর গলার সমস্ত ভাঁজগুলো জ্বল-জ্বল করছিল ঘামে, বুক ভেঙে বেরিয়ে আসছিল কাতরানি: আঁহ্... আঁহ্...

সে ঘাম কেউ দেখে নি। শোনে নি কাতরানি। কিনলে না তার ছড়ি। ছেলেটা তখন তার পকেট থেকে আইসক্রীম কেনার পয়সাটা নিয়ে এগিয়ে গেল বুড়োর কাছে। কিজিল কাঠের টাটকা ছড়িটা কিনলে সে। ছেলেটা ভেবেছিল সওদা বেচতে পেরে খুশি হয়ে উঠবে বুড়ো, কিন্তু তার অচঞ্চল মুখের ওপর কোনো আনন্দের চিহ্নই দেখা গেল না। দামটা নিয়ে বুড়ো মাথা হেলিয়ে দেখালে ছড়িগুলোর দিকে:

যেটা খুশি বেছে নে। হাতের কাছে যেটা পেল সেইটে নিয়ে চলে গেল ছেলেটা।

সেই থেকে প্রত্যেক দিন সে আসত বুড়োর কাছে, আইসক্রীমের বদলে কিনত কিজিল কাঠের ছড়ি। ঘরের কোণে তার জমে উঠল ছড়ির স্তূপ। ওর কিন্তু নতুন নতুন ছড়ি কেনার বিরাম নেই।

'গাছগুলো এমন খামোকা নষ্ট করছিস কেন বল তো?' মন্তব্য করেছিল একবার বাবার সেই পরিচিত।

ছেলেটা চুপ করে থাকে। কিন্তু পরের দিন ফের আরেকটি ছড়ি যোগ হয় তার মজুদে।

আর প্রত্যেক দিন সে ছড়ি কিনলেও কানে নেমে-পড়া শাদা পানামা-টুপিটা যেন বুড়োর নজরেই পড়ত না।

গ্রীষ্মের শেষ মাসটা শেষ হতে চলেছে। কমে গেছে গরম। গাঢ়, কালচে, তারা-ভরা সন্ধ্যাগুলো শুরু হয় তাড়াতাড়ি। কাছিয়ে আসছে চলে যাবার দিন। হঠাৎ ছেলেটার মনে হয়, ও চলে গেলে কে কিনবে তার ছড়ি?

যাবার আগেকার এমনি এক দিনে ছেলেটা গেল তার নিত্যকার সওদা কিনতে। নিজের অচল পশরা নুড়ির ওপর বিছিয়ে বসে ছিল বুড়ো। হয়ত ঢুলছিল সে, নয়ত মগ্ন হয়ে ছিল নিজের গভীরে। সামনে তার যখন শাদা পানামা-টুপিটা দেখা দিল, তখন একটু নড়লও না। যে ছড়িটাই কিনুক, ছেলেটার তাতে এসে যায় না, তাহলেও বুড়ো যাতে ক্ষুণ্ণ বোধ না করে সেজন্যে ছড়িদুটোকে অনেকখন নাড়াচাড়া করে তার একটিকে বাছলে। বেশ ভারি ছড়ি, তাজা ছালের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুচ্ছে তা থেকে। দাম মিটিয়ে ছেলেটা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু বুড়ো তার দিকে চেয়ে বললে:

'বস্ এখানে।'

উবু হয়ে বসল ছেলেটা।

'কাজ আমার একটা চাই-ই,' ছেলেটার দিকে না তাকিয়ে বললে বুড়ো, 'কাজ ছাড়া থাকতে পারি না।'

ছড়ি-বেচিয়ের গলা ছেলেটা এই প্রথম শুনলে: চাপা গলা, যেন তা উঠছে

সমুদ্রের গর্জন থেকে। কী উত্তর দেবে ছেলেটা তা ভেবে পেলে না। মুখে ওর চিন্তা ফুটে উঠল। বড়ো শাদা পানামা-টুপিটা খসে পড়ল একটা কান থেকে।

'আমি শিগগিরই চলে যাব... কী হবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করলে সে।

কোনো জবাব দিলে না বুড়ো। ঘড়ঘড়ে শব্দ করে চঞ্চল হয়ে কী একটা জিনিস বার করলে ন্যাকড়ায় মোড়া। সেদিকে নজর ছিল না ছেলেটার। বুড়ো কিন্তু ধীরে সুস্থে মোড়ক খুললে, মেটে-রঙা তার হাতে দেখা গেল রুপোর খোদাই করা একটা ছোরা। কালো খাপটায় রুপোর কাজ করা। গাঢ় লাল রঙের হাতলটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে কালক্রমে।

'ধর,' বলে বুড়ো এগিয়ে দিল পুরনো ছোরাটা।

প্রথমে ছেলেটা ভেবেছিল বুড়ো তাকে বড়োলোক ঠাউরেছে, কিজিল কাঠের ছড়িগুলোর মতো ছোরাটাও তাকে বেচতে চায়। প্রায় সে বলেই ফেলেছিল, 'আমার টাকা নেই,' কিন্তু বুড়োর মুখ দেখে খেয়াল হল ওটা বিক্রির জন্যে নয়, উপহার। তাহলেও এমন একটা উপহার নিতে সঙ্কোচ হল তার।

'ধন্যবাদ, কিন্তু না, না, আমার দরকার নেই,' বললে ছেলেটা, ছোরাটা ছোঁবারও সাহস হল না তার।

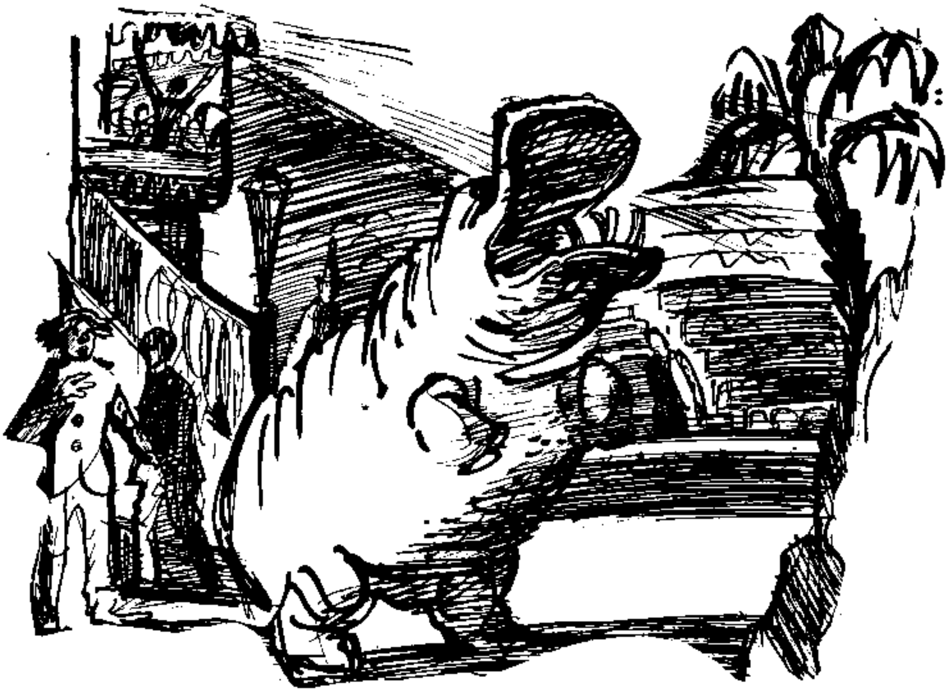
'নে, ধর!' দৃঢ়ভাবে বললে বুড়ো, 'তোকে আমার মনে ধরেছে। তুই একটা মানুষ।'

ছেলেটার হাতে সে যে-হাতিয়ারটা গুঁজে দিলে তা কেবল পরমবন্ধুই দান করে তার বন্ধুকে।

বেশ ভারি ছোরা, আর ওই ভারটার জন্যে কেন জানি বুক ভরে উঠল আনন্দে।

তারপর একা নিরিবিলিতে ছেলেটা বার বার করে ছোরাটা খুলেছে খাপ থেকে, দেখেছে, তারপর ফের ঢুকিয়ে রেখেছে।

ফলাটা ভালো করে দেখতেই হাতলের কাছে চোখে পড়ল একটা লেখা। হরফ-গুলো বেশ ক্ষয়ে গেছে, তাহলেও বালকের তীক্ষ্ণ চোখে তা ধরা না দিয়ে পারল না। হরফগুলো জুড়ে জুড়ে হয়ে উঠল শব্দ, আর সগর্বে সে শব্দ কঠোর ঘোষণা করেছে: 'বিশ্বস্ত বন্ধুকে!'



আমার জানা এক জলহস্তী

মানুষের স্বভাবই এই যে গ্রীষ্মে তার মন কেমন করে নীলাভ তুষার-কণা আর শার্সিতে বরফের নক্সার জন্যে। আবার শীতে তার চাই তপ্ত সূর্য, পল্লবের সবুজ খস-খস, বিলবেরির গন্ধ।

যাচ্ছিলাম আমি গভীর মুড়মুড়ে তুষারের ওপর দিয়ে আর ভাবছিলাম গ্রীষ্মের কথা। অনাড়ম্বর রুশী গ্রীষ্ম নয়, দক্ষিণী গ্রীষ্ম — জ্বলজ্বলে ফুলের গন্ধে যা চনমনে, পাথর যেখানে আতপ্ত, গরমে সমুদ্র যেখানে অলস, নিস্তেজ। ভাবতে ভাবতে আমার নিজেরই কেমন গরম ঠেকল, ওভারকোটের বোতাম খুলে ফেললাম, টুপিটা সরিয়ে দিলাম কপাল থেকে। তুষার-কণা হয়ে দাঁড়াল ঝুরঝুরে চকমকি বালি, ফার গাছ উঠে দাঁড়াল সাইপ্রাস গাছ হয়ে, পাইনের ডাল নড়ে উঠল পাম গাছের সবুজ পাখার মতো।

এই সময়েই শাদা তুষার স্তূপের ওপর দেখলাম গোলাপী মেঘ। আসছিল সে ধীরে ধীরে, এপাশ-ওপাশ হেলে দুলে। মাঝে মাঝে থামছিল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল আমার দিকে, তারপর আবার চলছিল নিজের মনে। ও এক জলহস্তী। পা তার দেখা যাচ্ছিল না, জলহস্তীদের পা হয় বেঁটে বেঁটে, নিশ্চয় তা ডুবে গেছে তুষারে — তাই মনে হচ্ছিল যেন জলহস্তীটা তার গোল পেটে আলগোছে তুষার ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে। জলহস্তীটা অবিশ্যি ঐ ঝুরঝুরে বালি, সাইপ্রাস, পাম গাছের মতোই কল্পিত।

তবে ইদানীং আমার জীবনে দেখা দিয়েছে পুরোপুরি বাস্তব এক জলহস্তী। কথা বলেছি তার সঙ্গে, কান চুলকে দিয়েছি। কান ওর ছোটো ছোটো, কাগজের তেকোণা ঠোঙার মতো মোচড়ানো — দুটি গোলাপী রঙের ঠোঙা। সার্কাসে সে খেলা দেখায়। খেলা দেখার পর আমি যাই যবনিকার আড়ালে ওকে দেখতে। সত্যি বলতে কি, খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর কান চুলকিয়ে দেবার। এ ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। যেমন, ছোট্ট একটা কুমিরেরও কান চুলকে দিয়েছিলাম। চোখ তার ছিল সবুজ, মণিটা পলকাটা কালো হীরের মতো। মুখের ডগাটা ওপর-মুখো, পুরনো জুতোর নাকের মতো। ছোটো ছোটো পাগুলো গায়ের সঙ্গে আঁটা আর ঘাড় থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত গোটা পিঠটায় সারি সারি ঢিপি। কুমিরটার কান চুলকিয়ে দিই আমি, সেও তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করে আস্তে ঘড়ঘড়িয়ে উঠেছিল। দেখাই যাক না, জলহস্তীটা আমার আদর নেয় কি ভাবে?

জলহস্তীটার রঙ কালচে-গোলাপী। মনে হবে যেন এইমাত্র তপ্ত জলে স্নান সেরেছে, সাবান-মাখা, বুরুশ-ঘষা, দলাই-মলাই হবার পর শুকনো ভাপে দাঁড় করিয়ে কাঁচা পল্লবের ঝাড়ন দিয়ে পেটানো হয়েছে তার গোলালো গা। ফলে গরম খেয়ে সাফসুফ হয়ে জন্তুটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্লেমিঙ্গো পাখির মতো গোলাপী। শুধু যেসব জায়গা সাফ করা যায় নি, সেগুলো মনে হয় কয়লার গুঁড়ো ছিটানো।

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলাম কাছ থেকে।

মাথাটা তার প্রকাণ্ড আর ভারী একটা ঘণ্টার মতো। বিরাট হাঁ-মুখটা চলে এসেছে কান পর্যন্ত, তার চারপাশে ফার গাছের কাঁটার মতো খোঁচা-খোঁচা পাটকিলে কুচি। কাঁটা-মোচ, কাঁটা-দাড়ি। যখন মুখ হাঁ করলে, আমি বলতে কি পিছিয়েই এলাম — গরম ভাপ-ওঠা দাঁতালো সে সীমাহীন হাঁ তার গোলাপী রঙে চোখ

ধাঁধিয়ে দেয়। গোলাপী জিভ, গোলাপী কণ্ঠা, গোলাপী তালু। তালু নয়, নবারুণ আকাশ। মনে হয় যেন ওই বিশাল গহ্বরে এক্ষুনি সূর্য দেখা দেবে। তার তপ্ত নিশ্বাস যেন সূর্যেরই সান্নিধ্য জানাচ্ছে...

হয়ত জলহস্তীটার কথা ভেবে, হয়ত-বা গভীর তুষার উজিয়ে হেঁটে চলার ফলে আমার গরম লাগতে লাগল। বরফের ওপর একটা তপ্ত পথ করে চললাম আমি, সামনে জেগে উঠল জলহস্তীর চোখ। সবসময় তা চেয়ে আছে শুধু একদিকে, অন্য কোনো কিছুর দিকে খেয়াল নেই। তবে সেটা নিষ্কর্মার অলস উদাসীনতা নয়, কিছু একটাতে তা নিবদ্ধ। হয়ত তার জন্মভূমির কথা মনে হচ্ছে, হয়ত ভাবছে তার সঙ্গিনীর কথা, কিছু হয়ত ব্যথা করছে তার...

যতবার সার্কাসে গেছি, জলহস্তীর কান চুলকে দিয়েছি। মোটা চামড়া ওর ঠান্ডা, কিন্তু আমার হাতের ছোঁয়ায় তা উষ্ণ হয়ে উঠত। চোখ বন্ধ করত না সে, ঘড়-ঘড় করত না। তাকিয়ে থাকত কেবল একদিকে।

জলহস্তীর কাছে আমি আসতাম তার বন্ধু, তার ট্রেনার স্তেপানের সঙ্গে। মুখ হাঁ করে জলহস্তী তাকে সেলাম জানাত তার অপূর্ব হাসি দিয়ে — আকর্ণবিস্তৃত হাসি, সারা দাঁত দিয়ে হাসি, উষ্ণ চোখ-ধাঁধানো হাসি। স্তেপান তার মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাড়ি চুলকিয়ে দিত তার পোষ্যের। জলহস্তীর দাঁত ওঠে ক্রমাগত। দাঁত ভেঙে যায়, আবার তা গজায়। আর কেবলি মাড়ি খুশ-খুশ করে তার, বাচ্চাদের দাঁত ওঠার সময় যেমন হয়। তারপর স্তেপান হাত লাগায় তার 'থলিতে' — খাপে-ঢাকা হাতিয়ারের মতো এই 'থলিতেই' লুকনো থাকে তার ছেদক দন্ত। পুরো একটা মুঠো ঢুকে যাবে তাতে। জলহস্তীকে আদর করার সময় তার 'থলি' চুলকিয়ে দেবার কথা কখনো ভুলো না কিন্তু; এটা তার ভারি ভালো লাগে।

স্তেপান আসতেই জলহস্তীটা হয়ে উঠত চুলবুলে। হুটোপুটি করত জলে, ছোট্ট লেজখানা নাড়াত, চারিদিকে জল ছিটিয়ে পড়ত তা থেকে। শুধু তার চোখ, জলহস্তীর ধাঁধা-ভরা চোখদুটিই থাকত অচঞ্চল, এমনকি বিষণ্ণ।

যাচ্ছিলাম আমি শীতের বন দিয়ে আর গোলাপী মেঘটা আমার পিছে-পিছে ফিরছিল সর্বত্র, গুলিয়ে দিচ্ছিল উত্তর দক্ষিণ শীত গ্রীষ্ম। মোট কথা, মধ্য আফ্রিকার অধিবাসী রাশিয়ায় থাকছে এটা মোটেই ঠিক নয়।

জলহস্তী আমাদের এখানে দেখা দেয় যত অপমানকর সব উপমায়: 'জলহস্তীর মতো ধুমসো', 'জলহস্তীর মতো বেঢপ', নিরেট, আকাঁড়া, মোটা-চামড়া... জলহস্তী কিন্তু আজ এই তিন দিন হল ছানি খাচ্ছে না। এখানকার ছানি ওর মুখে রোচে না। ক্লোভার ঘাস তাতে হয়ত খুব কম, আর টিমোথি ঘাস একটু তেতো। ঘোড়া গরুর অমন বাছবিচার নেই, অথচ এই মোটা-চামড়াটার আছে। চোখ তার বিষণ্ণ।

কান চুলকিয়ে দিই ওর, হাসে না। হয়ত ভাবছে তার সীমাহীন হাসিতে আমি যদি ভয় পেয়ে যাই। কিংবা হয়ত আমি তার হাসি পাবার যোগ্য নই — ওর জন্যে আমি সামান্য যেটুকু করেছি, ওর হাসিটা তার চেয়ে অনেক দামী।

ওর সঙ্গে কথা বলে স্তেপান, হুকুম দেয়, সব বোঝে জলহস্তী, কথা শোনে।

'শুয়ে পড়!'

জলে ঢেউ উঠে প্রচন্ড ধাক্কা মারে কানায়। প্রকান্ড দেহটাকে জলহস্তী তলিয়ে দেয় জলে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে যায় আর্কিমিডিসের সূত্র। একেবারে কানা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে। কিন্তু ভাসিয়ে তোলার শক্তিটাকে দাবিয়ে রাখতে পারে জলহস্তী। এমনিতেই জোর তার অসাধারণ।

'মাথাসুদ্ধ!'

জলহস্তীও আর নেই। একেবারে অদৃশ্য। যেন গলে গেছে। সামান্য দুলছে জল। বেশ কিছুক্ষণ পরে জলের ওপরে ভেসে ওঠে পেরিস্কোপের মতো চোখ। তারপর গোলকের মতো নাকের ফুটো। শেষ পর্যন্ত সশব্দে জল চলকিয়ে হুস করে ওঠে মাথা।

'সাবাস!'

হাসে জলহস্তী। মুখ হাঁ হয়ে যায়। ফুলে ওঠে নাকের ফুটো। খাড়া হয়ে ওঠে কান। হাসে না শুধু চোখ। সে চোখ রইল তার নিজের মনেই।

ঠিক ওই রকম এক জোড়া চোখের কথা আমার মনে পড়ল। অবিশ্যি তা মানুষের চোখ। লোকটা ছিল ভালোমানুষ, মোটাসোটা। মুখে তার বরাবর একটা দুঃখের ছাপ। দুঃখ ছিল তার বড়ো বড়ো ঢিপ-ঢিপ চোখে। গাল ছিল তার গোলাপী, কানদুটো ছোটো ছোটো...

তাহলেও জলহস্তীর চোখের রহস্য আমি ভেদ করেছি। তক্কে-তক্কে থেকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি। তার সুযোগ পেয়ে যাই যে ঘটনাটায়, সেটা স্তেপানের পক্ষে মারাত্মক হতে পারত। সাধারণ রিহার্সাল চলছিল সার্কাসে। আশ্চর্য অনায়াসে মেঘের মতো গোল দেহটার ভারসাম্য বজায় রেখে জলহস্তী ছোটো ছোটো থামের ওপর দিয়ে হে'টে যাচ্ছিল। হাঁটছিল সে পায়ের দিকে না তাকিয়ে, জলহস্তীদের পক্ষে পায়ের দিকে তাকানো এমনিতেই অসম্ভব — আর চোখ তার বরাবরের মতোই আছে নিজের ভাবনা নিয়ে। হে'টে যেতে সে পারত চোখ-বাঁধা থাকলেও। এরেনায় 'গজিয়ে উঠেছে' রবারের পাতা মেলা পাম গাছ, মাথা তুলেছে 'পাহাড়', পামের নিচে চরছে অ্যাণ্টিলোপ হরিণ।

অ্যাণ্টিলোপটা দেখতে এক প্রকাণ্ড ছোপ-ছোপ গরুর মতো, ঘোড়ার মতো সরু মাথা — তাতে লম্বা, ছুঁচলো, পাক-দেওয়া শিঙ। অ্যাণ্টিলোপ চরে বেড়াচ্ছে, আর কসরত অভ্যাস করছে জলহস্তী। তারপর জলহস্তী সরে গেল। সপাং করে শব্দ হল চাবুকের, অ্যাণ্টিলোপও চক্কর দিতে লাগল রঙ্গমঞ্চে। ছুটছিল সে হালকা লাফ দিয়ে দিয়ে, ওঠাচ্ছিল নামাচ্ছিল শিঙ, নাড়াচ্ছিল লোমের ঝুঁপি সমেত লেজ। স্তেপান তার ছুট দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে শব্দ করছিল চাবুকের। আর দূরে দাঁড়িয়ে জলহস্তী ডুবে ছিল নিজের চিন্তায়।

হঠাৎ চকে গেল অ্যাণ্টিলোপটা। বোঝা গেল না কেন: চাবুকের সপাঙে নাকি দরজা বন্ধের আওয়াজে। এমন চকে গেল যা শুধু অ্যাণ্টিলোপের পক্ষেই সম্ভব — হয়ে উঠল ক্ষিপ্ত, উদ্দাম, মরিয়া। লাফিয়ে গেল দূরে, ঝাঁপিয়ে পড়ল স্তেপানের ওপর। ভয়ংকর দুই শিঙের মাঝখানে পাথরের মতো কপালের ঢুঁ দিয়ে অ্যাণ্টিলোপ তাকে ঠেসে ধরল নকল পাহাড়ের গায়ে। চকা অ্যাণ্টিলোপের হামলাটা ঘটল এত অপ্রত্যাশিত ও এত বিদ্যুৎ-গতিতে যে কেউ বুঝে উঠতে পারল না কী ব্যাপার। স্তেপানও চুপ করে রইল। পরে বোঝা যায় যে, অ্যাণ্টিলোপের ঢুঁয়ে তার বুকে এমন চোট লাগে যে চে'চাতেও পারে নি, নিশ্বাস নিতেও পারে নি। বুনো জানোয়ারটার আরো একটা ছোট্ট ঢুঁ খেলেই ট্রেনারের প্রাণ যেত...

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশে দেখা দিল জলহস্তী। এতটুকু দেরি হয় নি এই গদাইলস্কর বিষণ্ণ-দৃষ্টি জন্তুটার। বন্ধুর বিপদ সে টের পেয়েছিল সবার আগে।

যেন এই সংকট-মুহূর্তটার কথা সে জানত, আগে থেকেই তৈরি ছিল তার জন্যে। সামান্য মাথা ঝাড়া দিলে সে, আর আটশ' কিলোগ্রাম ওজনের অ্যাণ্টিলোপ ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে চতুর্থ স্যারির আসনগুলোর ওপর। জলহস্তী ফের তার নিজের জায়গায় গিয়ে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

ওর চোখের রহস্য ফাঁস হয়ে গেল আমার কাছে। বন্ধুর যাতে বিপদ না হয়, সময় থাকতেই যাতে তাকে বাঁচাতে পারে, তার জন্যই একাগ্র হয়ে থাকত সে। এই কথাই সে ভাবত সর্বদা। মানুষকে ভালোবেসে এই হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র ধ্যান।

জানি না কেন গোলাপী রঙ ধরেছে তুষারে — সূর্যাস্তের আভায় নাকি আমার মনের মধ্যে যা রয়ে গেছে সেই জলহস্তীর হাসিতে। তুষারের ওপর দিয়ে উষ্ণ হাঁটাপথ ধরে আমি চলেছি। মেঘও গোলাপী হয়ে উঠল। এক পাল মেঘ — মন্থর, বর্তুলাকার। টুপি নাড়ালাম তাদের উদ্দেশে।



উর্স আর কেট

লকড়ি-গুদামটায় উঠে উর্সের কাছে ঘেঁষবে এমন কোনো ছেলের কথা আমি শুনি নি। কিন্তু একটি মেয়ের কথা জানি, কেট — সে এটা পারে। উর্সকে সে ভয় পায় না। কাঁটা-তারের তল দিয়ে সে ঢোকে, উর্স কিন্তু খেঁকিয়ে আসে না, ডাকে না

ভাঙা-ভাঙা গলায়, কামড়ে ছেঁড়ে না তার ফ্রক। দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব — রোগা সরু-ঠেঙে কেট আর দক্ষিণ রাশিয়ার পাহারাদার কুকুর উর্স।

ছেলেপিলেরা বলে, কেট কী একটা মন্ত্র জানে। সেটা বাজে কথা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে নাক কুঁচকে ওঠে তার। কেউ মিথ্যে কথা বললে সে বরাবরই নাক কোঁচকায়।

উর্স দেখতে প্রকাণ্ড। গায়ের লোম তার ঝুলে ঝুলে থাকে নোলকের মতো। কপালের নোলকগুলো পড়ে চোখের ওপর। চোখের সামনে অনবরত ওরকম নোলক দুললে নিশ্চয় দেখতে অসুবিধা হয়। কিন্তু কেট বলে, ওটা দরকার মাছি তাড়াবার জন্যে। কুকুর আর অন্যান্য জীবজন্তুর কথা কেট সবই জানে — সার্কাসে জন্তুজানোয়ারের খেলা দেখাবে সে। নামটাও সে নিয়েছে সার্কাসী কায়দায় — কেট। আসলে ওর নাম কিন্তু কাতিয়া।

ছেলেপিলেরা বলে, ও বেড়ে উঠেছে বনের মধ্যে, নেকড়ে-মা ওকে পালে। সে কথা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। চুপ করে রইল। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। থাকে সে মাসির কাছে, কেউ কিছু জানে না তার মায়ের কথা। বাপের কথাও। হয়ত মাসি ওকে ছিনিয়ে এনেছে নেকড়েনীর কাছ থেকে?

যে-কোনো নেকড়ের চেয়েও উর্স ভয়ঙ্কর। চোখ ওর ঠাণ্ডা, ভেজা-ভেজা ছেদক দাঁতগুলো আঙুলের মতো লম্বা। একবার এক চোরের প্যাণ্ট ছিঁড়ে দেয় সে, কামড়ও বসায় জবর। ভয়ঙ্কর হিংস্র কুকুর। কিন্তু কেট বলে সে নাকি ভারি ভালো।

আমি বলি: ভালো আবার কোথায়, যাকে খুশি তাকে টুকরো-টুকরো করে দেয় যে! কেট বলে, লোকে ওকে হিংস্র করে দিয়েছে; তেমন লোক তো আছে।

'আচ্ছা, এমন লোক আছে যারা ওকে ভালো করে দিতে পারে?'

এক পা দিয়ে আরেক পা চুলকে কেট বললে:

'কে জানে। হয়ত আছে।'

'আর তুই ওকে ভালো করে দিতে পারিস না, কেট?'

কেট মাথা নাড়লে:

'আমার সঙ্গে ওর ভাব হতে পারে। তবে অন্যের ওপর সে হিংস্রই থাকবে।'

'কিন্তু কী করে হিংস্র করে দিলে উর্সকে?'

'জানি না... হয়ত খেতে না দিয়ে।'

আমি ভাবলাম কেট চুপি-চুপি উর্সকে খাওয়ায়, উর্সও তাই কৃতার্থ হয়ে ওকে কাছে আসতে দেয়। কিন্তু ব্যাপারটা দেখা গেল অন্যরকম। খাওয়া উর্স পেত নিয়মমতোই।

কেটের সঙ্গে আমার ভাব দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে। ওকে বসানো হয় আমার পাশেই। জিজ্ঞেস করেছিলাম:

'তুই কী ভাবে পড়িস, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে নাকি আঙুল দিয়ে দিয়ে?'

'আঙুল দিয়ে,' কবুল করলে কেট।

'আঙুলগুলো মুঠো করে রাখিস,' পরামর্শ দিলাম আমি।

'তুই ঠোঁট কামড়ে থাকিস,' উপদেশ দিলে কেট।

এখন অবিশ্যি আমরা পড়ি বড়োদের মতোই — চোখ দিয়ে।

কেটের নিজের কোনো কুকুর ছিল না, এমন আশাও ছিল না যে কোনো দিন হবে। উর্সের ওপর তার টান পড়ল। লকড়ি-গুদামটার কাছে গিয়ে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। উর্স কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলে না। কেট তখন মরচে-পড়া কাঁটা-তারটার কাছে গিয়ে এমনভাবে তাতে টান মারলে যে একেবারে ঝন-ঝন করে উঠল। দুই লাফে উর্স এসে গেল পাশেই। লোমের নোলকগুলোর তল থেকে চক-চক করে উঠল চোখ, বেরিয়ে এল হিংস্র হলদেটে ছেদক দাঁত। গর্-গর্ করে উঠল উর্স... লাফিয়ে পালিয়ে আসতে পারত কেট, কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল সে: চওড়া-চওড়া তার হাই বুট, মুগুরের মতো পা, হাঁটুর কাছে মোজা রিপু করা। ঠাণ্ডায় নীল-হয়ে-আসা মুখখানা সে নিয়ে এল কাঁটা-তারের কাছেই, কথা বললে উর্সের সঙ্গে। প্রথমটা সে কান দেয় নি, গর্জে উঠল। তারপর দাঁত বন্ধ করল।

দেখা গেল কুকুরকে শুধু খাওয়ালেই হয় না, তার সঙ্গে কথাও বলতে হয়। উর্সের সঙ্গে কিন্তু কেউ কথা কইত না। নিজেই ভেবে দ্যাখো, পাশ দিয়ে অসংখ্য লোক চলে যাচ্ছে, কিন্তু তোমায় নজরই করছে না, কথাও বলছে না। খিদের চেয়েও এটা সাংঘাতিক। সত্যি বলছি।

উর্সের সঙ্গে কথা কইলে কেট। অভ্যাস নেই তো, তাই গর্জে উঠে মাথা ঘুরিয়ে নিলে উর্স। কিন্তু পরে শুনলে, কৌতূহলের বশে আর কি। কেট কী বলছে উর্স

অবশ্য তা কিছু বোঝে নি, যে-কুকুরের সঙ্গে কেউ কথা বলে না, সে তা বুঝবে কী করে। কিন্তু লম্বা-ঠেঙে কেটের গলার স্বরে সে এমন একটা কিছু টের পেলে যেটা তার জুটছিল না। শব্দ না বুঝলেও কণ্ঠস্বরটা সে বুঝেছিল। কেটের গলার স্বর ছেলেদের মতো: গাঢ়, ভাঙা-ভাঙা। কিন্তু সে গলার স্বরটা উর্সের পছন্দ হল, মনে ধরল। এমনকি পাশকেভাবে মাথাও নোয়ালে। কুকুর যে কথা শুনছে, আলাপ করছে, এটা তার প্রথম লক্ষণ।

লকড়ি-গুদামটা যখন খোলা থাকত, উর্স তখন বাঁধা থাকত শেকলে। কিন্তু গুদাম বন্ধ করার পর ও হয়ে বসত সেখানকার সর্বেসর্বা। আমার মনে হয় কেট যদি সেখান থেকে কিছু কাঠ নিতে চাইত, তাহলে উর্স কিছু করত না। কিন্তু কাঠে কেটের আগ্রহ ছিল না। তার আগ্রহ উর্সে। নোলকগুলোর ফাঁক দিয়ে তার নজরে পড়ল যে উর্সের চোখে পুঁজ হয়েছে।

‘বেচারি কুকুর!’ বললে কে একজন বুড়ি।

রেগে কেট চাইলে তার দিকে। বললে:

‘জন্তু-জানোয়ারকে সারিয়ে তোলার চেয়ে করুণা করা অনেক সহজ।’

কেট ঠিক করলে উর্সের চিকিৎসা শুরু করবে।

কাঁটা-তারের কাছে কেটের অপেক্ষায় থাকত হিংস্র কুকুরটা। আনন্দের বেলায় সব কুকুরই এক: বড়ো, ছোটো, ঝাঁকড়া, চিকন, বুড়ো, বাচ্চা — আনন্দ হলে সব কুকুরই লেজ নাড়ে। কেট এলে উর্স আনাড়ীর মতো লেজ নাড়ত — অনভ্যাসের ফলে আর কি। কেট অবিশ্যি ওর জন্যে এটা-ওটা নিয়ে আসত, কিন্তু অমন এক প্রকাণ্ড কুকুরের কাছে এক টুকরো সসেজ আর রুটি তো প্রায় কিছুই না। উর্স ওর অপেক্ষায় থাকত সসেজের জন্যে নয়।

লকড়ি-গুদামের সামনে কেট দাঁড়িয়ে রইল অনেকখন, আর বরফের ওপর বসে উর্স তাকে দেখছিল তার লোমের নোলকের ভেতর দিয়ে। ছেদক দাঁতের বদলে উর্স বার করে রেখেছিল তার জিবের প্রান্তটুকু। কাঠের গাদা থেকে বনজ সোঁদা গন্ধ উঠছিল, তার পেছু-পেছু আসছিল রজন, ব্যাঙের ছাতা, মধুর গন্ধ। আড়ষ্ট-হয়ে-যাওয়া পায়ের কথা ভুলে কেট সে গন্ধ নিচ্ছিল বুক ভরে। উর্সও। উর্সের জিবে সবুজ একটা ঘাস চোখে পড়ল তার।



তারপর হাত বাড়িয়ে দিলে কেট। অভ্যেসবশে গর্-গর্ করে উঠল উর্স, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লেজ নামিয়ে নিলে লজ্জায়। হাত সরিয়ে নিলে না কেট। হয়ত খুবই সে সাহসী, কিংবা খুবই ভরসা ছিল উর্সের ওপর। তার নখ-আঁচড়ানো নোংরা লোমের মধ্যে হাত দিলে কেট। আরামে গা কুঁকড়ে উঠল কুকুরটার।

একদিন রবিবার, লকড়ি-গুদাম যখন বন্ধ, কাঁটা-তারের তল দিয়ে কেট ঢুকে পড়ল একেবারে বাঘের খাঁচায়! — এগিয়ে গেল সোজা উর্সের কাছে। আশপাশ দিয়ে যারা

যাচ্ছিল, তারা ঐ সরু-ঠেঙে বোকা মেয়েটার জন্যে ভয়ে অস্থির হয়ে চেঁচামেচি লাগালে -- ভয়ংকর উর্সের একেবারে থাবার নাগালে যে।

কেট কিন্তু জানত যে উর্স ভারি ভালো। তাকে সে কামড়ে টুকরো-টুকরো তো করলই না, বরং নাক নামিয়ে তার ঝাঁকড়া মুখটা ঘষতে লাগল তার পায়ে।

প্রকান্ড কুকুরটাকে বসিয়ে কেট তার লোম আঁচড়াতে লাগল। প্রাণপণে সে তার লোম টানছিল — অমন কুকুরের লোম আঁচড়ে দেওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! — উর্স কিন্তু গর্-গর্ও করলে না, কামড়ও দিলে না। সহ্য করে গেল। বলতে কি, আরামই লাগছিল তার, কৃতার্থের মতো চাইছিল কেটের দিকে।

লোকে কিছুই বুঝতে পারলে না ব্যাপারটা। কেউ কেউ বললে — ছুটে বন্দুক নিয়ে আয়। কেউ কেউ বললে — ছুটে গিয়ে ওর মাসিকে খবর দে।

কেট ভ্রূক্ষেপও করলে না। চোখের জন্যে কী একটা ওষুধ দিলে সে উর্সকে। উর্স সেটা চেটে নিলে জিব দিয়ে। আর কাঠের স্তূপগুলোর মাঝখান দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল পাশাপাশি — উর্স আর কেট। বার্চ, অ্যাস্প, পাইন। বেড়াতে লাগল তারা কাটা গাছগুলোর মধ্যে, কেননা অন্য কোনো গাছ তো ছিল না।

বাড়িতে বেশ একচোট বকুনি খায় কেট। এমনিতেই বকুনি তার জোটে ঘন-ঘন। মুখ ভার করে ঘোরে সে। আর তার নামে যত গাঁজাখুরি গল্প রটিয়ে বেড়ায় ছেলেগুলো, যদিও উর্সের কাছে যেতে পারলে ওরা বর্তে যেত। গিয়ে তার এলোমেলো লোমে হাত বুলিয়ে যদি বলতে পারত:

'ভারি ভালো কুকুরটা।'



চলল তারা পাশাপাশি

আফ্রিকাতেও কিরণ দেয় আমাদের এই একই সূর্য। কিন্তু সূর্য সেখানে মাটির অনেক কাছে, তাই রোদ হয় কাঠ-ফাটা। আর সিংহ ভাবে সূর্য বোধ হয় দুটো: একটা গরম, একটা ঠাণ্ডা।

সিংহ থাকে খাঁচায়। যেন লাইন-টানা কাগজের ওপর আঁকা। আঁকা হয়েছে হলুদ-বাদামী রঙে। সিংহের আধখানায় ঘন, লম্বা লম্বা চুল, অন্য আধখানা রোগা, লোম-ছাঁটা, মসৃণ। হয়ত আধখানায় তার সর্বদাই গরম লাগে, অন্য আধখানায় ঠাণ্ডা।

খাঁচায় থাকলে শুধু এক জায়গাতেই থাকতে হয়, কিছুই ভালো করে দেখা হয় না। যেমন, শুঁড়-ওয়ালা একটা মাথা দেখতে পায় সিংহ, কুলো-পানা তার কান। কিন্তু মাথার ওই মালিকটির পা কটা, তা সে জানে না। নাকি তিমি মাছের মতো লেজ নেড়ে সে সাঁতরাচ্ছে? ক্ষুর-ওয়ালা চারটে সরু সরু ঠ্যাঙ দেখতে পাচ্ছে সিংহ, আর সে ঠ্যাঙ থেকে কোথায় কোন গাছের মাথা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো শিঙ সমেত এইটুকু এক মুণ্ডু।

কিছু কিছু পড়শীদের সে আদৌ দেখতে পায় না। শুধু তাদের ডাক শোনে। ভাবে, যার ডাক যত জোরালো ততই সে হবে প্রকাণ্ড। অথচ সবচেয়ে জোরে চেঁচামেচি করে কেবল হাঁসগুলো।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোপুরি যাদের সে দেখতে পায়, তারা হল মানুষ। ছোটো, বড়ো, কালো-চুলো, শণ-চুলো, চুপচাপ, কিঁচকিঁচে — নানান রকমের। লোকেই তাকে খাওয়ায়। রোগ হলে চিকিৎসা করে। এমনি স্রেফ দেখতে আসে। আর তার সম্পর্কে কে কী বলছে, আগ্রহ করে সিংহ তা শোনে।

'সিংহের আধখানার লোম ছেঁটে ফেলেছে, আধখানা ছাঁটা হয় নি,' বাবাকে বলে ছোট্ট এক খুকি, আনমনার মতো মাথা নাড়ে বাবা।

সিংহ বোঝে যে ওটা ঠাট্টা, তাই আপন মনে হাসে: মোচ নাড়ায়।

অসমান দাঁতের এক খোকা মায়ের হাত টানাটানি করে বলে:

'আমায় একটা সিংহ কিনে দাও-না!'

'রাখব কোথায় শুনি?'

'দিদিমার ঘরে।'

সঙ্গে সঙ্গেই খোকার হাত টেনে মা তাকে নিয়ে যায় সেই খাঁচাটার কাছে, যেখানে শুঁড়-ওয়ালা প্রকাণ্ড মাথাটা ভেসে আছে।

সারাদিন দর্শক এসেছে দেখতে। সিংহ হয় বসে থেকেছে নয় ছোটো ছোটো চামড়ার বালিশের মতো থাবার ওপর মাথা রেখে সটান হয়েছে। ঘুমের পর সে পিঠ বাঁকিয়ে খাঁচার কাঠের মেঝেতে ঘষে ঘষে শান দিয়েছে নখে।

রোজ দেখা হয় এমন বন্ধু সিংহের আছে। যেমন, পেত্রভ। সিংহকে মাংস খাওয়ায় পেত্রভ, খাঁচা পরিষ্কার করে। গা থেকে তার তামাকের গন্ধ ছাড়ত, মাঝে

মাঝে মদের। তবে সহ্য করে যেত সিংহ। বন্ধুর জন্যে লোকে কী না সহ্য করে!

রোজ খাঁচার সামনে দিয়ে যেত মিলিশিয়াম্যান। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করত বেল্ট, ঝক-ঝক করত বোতাম। সিংহের দিকে চোখ মটকে সে বলত:

'এই যে ভায়া!'

মোচ নাড়াত সিংহ, বাঁ চোখ কুঁচকে তুলত। মিলিশিয়াম্যানের নাম সে জানত না, তাই তাকে ডাকত 'এই যে ভায়া'।

তাছাড়া সে চিনত আইসক্রীম-পশারিনীকে, মোটাসোটা, মুখখানা লাল। ঠান্ডা মাল বেচলেও সবসময়েই তার গরম লাগত। একবার সে আইসক্রীম দেয় সিংহকে। এতই তা সুস্বাদু যে সিংহ কাঠি সমেত গোটা জিনিসটাই গিলে ফেলে!

আর ছিল চিজ়িক। একটি বাচ্চা ছেলে সে। সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তার। স্বপ্ন দেখত সে পেত্রভ হবে, সিংহকে খানা দেবে, সাফ করবে তার খাঁচা। একবার সিংহের পক্ষ নেয় চিজিক: সিংহ খাঁচায় থাকলে কেউ তাকে ভয় পায় না, এমনকি অপমান করতে, ঢিল মারতেও পারে।

এক ঢ্যাঙাকে একদিন ধমকেছিল চিজিক:

'খবরদার, সিংহকে ঢেল্যাবি না বলছি!'

চিজিককে পিটিয়ে দেয় ঢ্যাঙাটা। অথচ সিংহ তার পক্ষ নিতে পারে না। খাঁচার মধ্যে ছটফট করে সে।

একবার গ্রীষ্মের সকালে সিংহের চোখে পড়ল খাঁচার দরজাটা যেন সামান্য খোলা। তা দেখে সিংহ থাবা দিয়ে সামান্য ঠেলা দিলে। ক্যাঁচকোঁচিয়ে খুলে গেল দরজা। নাক কোঁচকালে সিংহ, মোচ নাড়ালে, বেরিয়ে এল খাঁচা থেকে। ভাবলে একটু বেরিয়ে টেরিয়ে ফিরে আসবে। রাস্তার ভেজা বালিতে ধীরে ধীরে থাবা পেতে সিংহ হেলে দুলে এগুল। কোথাও যাবার তার তাড়া ছিল না। শুধু পায়চারি করে আর এদিক-ওদিক তাকায়।

শুঁড়-ওয়ালা মুন্ডুটার নাম হাতি, দেখা গেল সে ভেসে থাকে না, লেজও তার তিমির মতো নয়, — সাধারণ শুকনো লেজ, ডগায় চুল নেই। আর সরু সরু

ঠ্যাঙগুলো আর ছোট্ট শিঙ-ওয়ালা মুণ্ডুটার মালিক কেবল একজনই — জিরাফ! আর সবার চেয়ে জোরে চ্যাঁচায় হাঁসেরা।

ফুর্তি হল সিংহের, লেজ নেড়ে সে এগিয়ে চলল।

এক জায়গায় দেখা হল পেত্রভের সঙ্গে। খুশি হয়ে সিংহ কদম বাড়ালে। পেত্রভ কিন্তু থমকে গিয়ে টলতে টলতে পড়ে গেল মাটিতে। পেত্রভের কাছে এল সিংহ। কানে গেল যে পাহারাদারের বুক ধুক-ধুক করছে, ভাবলে নিশ্চয় ঘুমচ্ছে। তাই ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ঘুমন্ত পাহারাদারকে ডিঙ্গিয়ে সিংহ এগুল ফটকের দিকে।

বেরিয়ে বেড়াবার সময় বন্ধুর দেখা পেলে খুবই আনন্দ হয় বৈকি। অচেনা জগতে মনে হয় নিশ্চিন্দি। শুধু একটা জিনিসে ভারি বিব্রত লাগল সিংহের — পরিচিতদের অদ্ভুত সব ব্যবহার। ও কিছুতেই বুঝে পাচ্ছিল না কেন ওকে দেখেই মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছে হল পেত্রভের, কেনই বা দৌড়বার দরকার পড়ল আইসক্রীম-পশারিনীর। অমন মোটাসোটা ভারিক্কী মেয়েটি যে অত জোরে ছুটতে পারে তা সিংহ কখনো কল্পনাও করে নি। সিংহের দিকে মাথাও নাড়লে না সে, আইসক্রীমের ভারি বাক্সটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুট লাগালে। বাক্সের নিচে জমে উঠল শাদা মিষ্টি জল। সিংহ তা চেটে দেখলে, কিন্তু এবার আইসক্রীম তার পছন্দ হল না।

চট করেই সে শহরে ঢোকে নি। চিড়িয়াখানার গেটের কাছে খানিক দাঁড়িয়ে সে চেয়ে রইল শহরের অদ্ভুত, অপরিচিত জীবনযাত্রার দিকে। পাথুরে রাস্তার ধার বরাবর সারি দিয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খাঁচা, তাতে জানলা বসানো। কাছ দিয়ে যাচ্ছে লোক। অজস্র লোক।

অদ্ভুত এক ধরনের জানোয়ার দেখতে পেলে সিংহ, ঢিপ-ঢিপ চোখ তাদের কাচের, থাবাগুলো নরম, গোল-গোল। থামছে সেগুলো, লোক উগরে দিচ্ছে, ফের নতুন লোক গিলছে। এই নরখাদকদের লোকে ভয় পাচ্ছে না, নিজেরাই তারা ইচ্ছে করে ঢুকছে মুখ-গহ্বরে, সিংহের মনে হল যেন লোকের ভয়ই হচ্ছে পাছে তাদের খেয়ে নিতে জন্তুটার দেরি হয়।

কাঁধ নাড়ালে সিংহ। কেশর ঝাড়া দিলে — এই ভাবেই ওরা সেজেগুজে নেয় — তারপর এগুল শহরে।

সিংহ দেখে সবাই ছুটে পালাল। জোয়ান, বুড়ো, লাল-চুলো, মুটকো, বড়ো, ছোটো, রোগা, টেকো, কোঁকড়া-চুলো — সবাই যে যেমন পারে, হাঁস-ফাঁস করে, হোঁচট খেয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে, খুটখুটিয়ে ছুট লাগাল পাল্লা দিয়ে।

ফুর্তিবাজ মিলিশিয়াম্যান 'এই যে ভায়া' গাছে উঠে পড়ে শিস দিতে লাগল পাখির মতো — যেন এক মস্ত নীলরঙা পাখি, কাঁধে তার লাল লাল পালক।

এই ছোটাছুটিতে প্রথমটা সিংহের মজাই লেগেছিল। এমনকি নিজেও সে একটু ছুট লাগায়। লোকে কিন্তু ছুটছিল তার চেয়েও জোরে। চোখ তাদের হয়ে উঠছিল গোল-গোল, ফ্যাকাশে মুখ, দু'ঠোঁট চাপা।

সিংহের ইচ্ছে হচ্ছিল ডেকে বলে:

'আরে দাঁড়াও, ছুটছ কোথায়? এসো না একসঙ্গে যাই, ঘুরে বেড়াই, গরম হয়ে নিই রোদ্দুরে...' .

কিন্তু বলতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে যে হতাশ গর্জন বেরুল, তাতে আড়ষ্ট হয়ে গেল গোটা শহর।

গোল-গোল থাবার ওপর নীলরঙা জন্তুটার কাছে গেল সিংহ। শুঁকে দেখল। আঁচড়াল থাবা দিয়ে। নীল জন্তুটা গজরালে না, খেঁকালেও না। দাঁড়িয়ে রইল যেন মাটিতে পোঁতা, লোকজন খাচ্ছে না, উগরেও দিচ্ছে না।

ফাঁকা শহরটায় ভয়-ভয় করে উঠল সিংহের — এ যেন এক বিশাল অচেনা তৃণক্ষেত্র, সূর্য যেখানে ঠাণ্ডা। সবাই ফেলে পালিয়েছে তাকে। সবাই তার সঙ্গে বেইমানি করেছে। কিন্তু কী জন্যে? লোকেদের যে ও খুবই ভালোবাসে। চোখে জল এসে গেল সিংহের।

নির্ভীক উদারচেতা পশু সে। তাকে পশুরাজ বলা হয় এই জন্যে নয় যে তার জোর বেশি — হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী তার চেয়ে অনেক বলবান। সিংহ পশুরাজ, কারণ কখনো সে আড়াল থেকে আক্রমণ করে না, আর লড়াইয়ে নামার সময় আগেই হুঁশিয়ারি দেয়। কিছুতেই ভয় পায় না সে। কিন্তু ফাঁকা শহরে তার ভয় লাগল। নিঃসঙ্গতার জন্যে।

ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসলে সে মাথা হেঁট করে।

নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একটা পরিচিত পদশব্দ কানে এল তার। চাইতেই সে দেখলে চিজিককে। বইয়ের ব্যাগ দোলাতে দোলাতে ইশকুলে যাচ্ছিল ছেলেটা, গান গাইছিল শিস দিয়ে:

'শি-শিউ-শে-শে!'

সিংহকে দেখে চিজিক ভয় পেলে না, বরং খুশিই হল সে। বললে:

'নমস্কার!'

জবাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে সিংহ।

'ব্যাপারটা কী?'

সিংহ ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাকালে মৃতপ্রায় শহরটার দিকে। চোখে পড়ল জানলা দিয়ে লোকে চেয়ে আছে তার দিকে।

'চল যাই,' বললে চিজিক। 'মাথা হেঁট করিস না,' বললে চিজিক। 'আমারও অমন হয়,' বললে চিজিক, 'চল যাই।'

চলল তারা পাশাপাশি। চলল ফাঁকা শহরটা দিয়ে, লোকে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে অবাক হচ্ছিল, যেন অভাবনীয় কিছু একটা ঘটেছে। অথচ কিছুই ঘটে নি। স্রেফ দুই বন্ধুর দেখা হল, পাশাপাশি চলছে। এতে চোখ কপালে তোলার কী আছে?

শুধু সিংহটা এখন কোনো লাইন-টানা কাগজে নয়, শাদা কাগজে আঁকা।

পরে ঘটনাটা সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু অনেকদিন সিংহকে এই প্রশ্নটা খুঁচিয়েছে: খাঁচায় থাকলে, সবাই তাকে কেন ভালোবাসে আর স্বাধীনতা পেলেই পালায়? খাঁচার ভেতরকার সিংহ আর ছাড়া-পাওয়া সিংহ তো একই সিংহ, উত্তুরে শহর আর উত্তপ্ত আফ্রিকার আকাশে তো সেই একই সূর্য।



আমার বোলতাটি

আমার গোলাঘরে বাসা নিয়েছে এক বোলতা। কাছ দিয়ে গেলেই কানে আসে গাঢ় ভন-ভন আর হালকা আওয়াজ। মনে হবে যেন বোলতাটা খুব আড্ডাবাজ, একদল ইয়ার-বোলতা নিয়ে ফুর্তি লুটছে। আসলে মোটেই কোনো ইয়ার-দল নেই। নেহাৎ গরম দিনটার পর বোলতা তার ছোট্ট ফ্যানটা খুলে দিয়ে বাড়িটায় হাওয়া খেলায়। আর তার ক্ষিপ্র-চলা পাখা থেকে ওঠে অবিরাম এক জমজমে গুঞ্জন: জজজ-জজজ-জজজ!

দেখা গেল বোলতাটা খুবই মার্জিত রুচির বাসিন্দা: আমার পায়ের শব্দ শোনামাত্র সে তার ফ্যান বন্ধ করে দেয়, যাতে ওর শব্দে আমার অসুবিধা না হয়। ঘরে হাওয়া খেলাতে সে শুরু করে কেবল আমি চলে যাবার পরে। সাধারণতই সে আমার চোখে না পড়ার চেষ্টা করে। তাই বোলতাটা দেখতে কেমন সেটা কল্পনা করার জন্যে আমায় স্মৃতি ঘাঁটতে হয়।

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল — ফেলিয়া। নানা ধরনের গুবরে, ফড়িং, ভোমরা সংগ্রহ করা ছিল তার শখ। বোলতাও ছিল তার সংগ্রহে। বড়ো একটা বিচির মতো দেখতে, বাঘের মতো ডোরাকাটা, টিপ-টিপ চোখ-ওয়ালা কালচে মাথা। বোতলের ছিপিতে ওটা গাঁথা ছিল পিন দিয়ে; তলে লেখা: 'বোলতা — মাটিবাসী মৌমাছি'।

ওর বইয়ের ব্যাগটা খসিয়ে নিই। ফেলিয়া আমায় চিমটি কাটে। আমি তাকে তখন

ফেলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় অদ্ভুত। একবার ইশকুলের করিডরে ধাক্কা দিই। ফেলিয়া গিয়ে ঠোকর খায় দেয়ালে আর আমায় দাঁড়াতে হয় মাস্টারদের ঘরে।

'তুই মেরেছিস ওকে?' জিজ্ঞেস করলেন ইতিহাসের শিক্ষিকা রিমা ইলিনিচনা, দেখতে ছোটোখাটো, তড়বড়ে।

আমি চুপ করে রইলাম।

'তুই মেরেছিস ওকে?' ফের জিজ্ঞেস করলেন, জোর দিলেন 'মেরেছিস' কথাটায়।

'ধাক্কা দিয়েছি,' অস্ফুটে বললাম আমি।

'আর তুই জানিস যে ও রুগ্ণ?'

সেটা জানতাম না।

'খেয়াল করিস নি কখনো যে ওর চোখের কোলে কালশিটে?'

আমি ভাবতাম নিশ্চয় কালি লেগে গেছে কেমন করে।

চেয়ার ক্যাঁচকোঁচিয়ে উঠল। রিমা ইলিনিচনা উঠে দাঁড়ালেন।

'এর ফল কী হতে পারে তা জানিস?' আমার কাছে এসে চোখ বড়ো বড়ো করলেন তিনি, 'যে-কোনো মুহূর্তে ও মারা যেতে পারে। তুই ধাক্কা দিলি, ও ওদিকে মরে গেল।'

দিশেহারা হয়ে উঠলাম আমি।

'আমি শুধু একবার... ধাক্কা দিয়েছি।'

'একবারেই যথেষ্ট।'

আমার একেবারে হয়ে এল। ভয় লাগল আমার। মনশ্চক্ষে ফেলিয়াকে দেখলাম... মরা। কফিনে। পরনে ইশকুলের উর্দি। পায়ে নোংরা তোবড়ানো জুতো। পেটের ওপর বইয়ের ব্যাগ...

করিডরে ফিরে প্রথমেই ছুটলাম ফেলিয়ার সন্ধানে। বেঁচে আছে! জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সসেজের স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। ফাঁড়া কাটল।

ফেলিয়ার মুখখানা রোগা, লম্বাটে, লাল-লাল কান। এমন কান যেন তৈরিই হয় কেবল চশমার আংটা ধারণের জন্যে। আর চশমায় তার মোটা-মোটা কাঁচ, তার ভেতর দিয়ে চোখ ঠাহরই হয় না। টলমল করে চোখ। পরিণত হয় দুটো ধূসর রঙের মাছে, ভেসে বেড়ায় যেন গোল-গোল অ্যাকুয়ারিয়মে। সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেই চক্ষু-রূপী মাছ কোথায় পালিয়ে যায়... এই ধরনের চোখে জিনিসগুলো বড়ো দেখায় না, ছোট্ট হয়ে যায়। সবকিছু বড়োই দেখায় ছোটো-ছোটো।

শিক্ষিকার সঙ্গে ওই আলাপটার পর থেকে আমি ফেলিয়াকে ভয় পেতাম। ভয় পেতাম যেন একটা চীনেমাটির ফুলদানি, এই বুঝি হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুর-চুর হয়ে যাবে। ফেলিয়াকে এড়িয়ে আমি দূরে থাকতাম যাতে দৈবাৎ ওর সঙ্গে ধাক্কা লেগে না যায়। ওভারকোট রাখার ঘরে যখন হুড়োহুড়ি বাধত, আমি তখন ওকে আড়াল করার চেষ্টা করতাম, বাঁচাতাম মৃত্যুর বিপদ থেকে।

ক্রমশ ক্লাসে ওর অবস্থা দাঁড়াল আলাদা রকমের। শরীরচর্চা থেকে ওর ছিল বরাবরের ছুটি, আমরা যখন লাফালাফি করতাম, বৈঠক দিতাম, মইয়ে চাপতাম, ও তখন ওভারকোট রাখার ঘরে বসে মোটা-মোটা বই পড়ত।

ওর ছিল সাতখুন মাপ। ইশকুল কামাই করলে কেউ জিজ্ঞেসও করত না, কেন। সাংঘাতিক অসুখটাই যে তার কারণ সেটা সবাই জানত।

হয়ত ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার ডাক পড়েছে ওর, অথচ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না।

'জানিস না?' চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করেন শিক্ষয়িত্রী।

ও চুপ করে থাকে।

'পড়া করিস নি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার লম্বা-লম্বা সরু আঙুলগুলো টান করে দাঁড়ায় ফেলিয়া। ভাবখানা এমন যেন বলতে চাইছে: হ্যাঁ, পড়া করি নি, কেননা ওই রহস্যময় ব্যাধিটায় ভুগছি। অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নেন শিক্ষয়িত্রী।

'যাক গে, তাতে কী হয়েছে, পরের বার উত্তর দিস। যা, বস গে... অস্থির হস নে।'

ফেলিয়ার মুখে কিন্তু আনন্দ নেই। কষ্টই ফুটে উঠেছে সেখানে। চুপচাপ হয়ে যায় গোটা ক্লাস।

মাঝে মাঝে ক্লাসে বসে থাকতে বিরক্ত ধরে যেত ফেলিয়ার। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলত:

'রিমা ইলিনিচনা, আজ্ঞা করুন আমি আজ যাই। হেলমিণ্টোলজিস্ট ডাক্তার দেখানোর কথা আছে।'

শোকাভিভূত দৃষ্টিতে রিমা ইলিনিচনা ফেলিয়ার দিকে চেয়ে বলতেন:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। তুই যেতে পারিস।'

বইয়ের ব্যাগ নিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে সে বেরিয়ে যেত দরজা দিয়ে আর উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি চেয়ে থাকতাম সেদিকে, যেন এক মহাকীর্তিতে তাকে এগিয়ে দিচ্ছি।

আমার গোলাঘরে বোলতাটা বাসা নিলে বটে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারতাম না ঠিক কোথায় ও থাকে। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকতাম যাতে বোলতাটি আর তার পুত্রপরিজন আমার আগমন টের না পায়। চুপ করে ধরতে চাইতাম কোত্থেকে আসছে ওই গাঢ় গুঞ্জনটা। পরখ করে দেখলাম দেয়ালগুলো। মাটির মেঝে তল্লাস করলাম। আর ক্লান্তিহীন 'জ' অক্ষরটা ধ্বনিত হয়েই চলল কখনো জোরে, কখনো আস্তে, যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে বোলতা।

একদিন গোলাঘরে এসে পকেট থেকে চাবিটা বার করছি, এমন সময় তালার ফুটো থেকে বেরিয়ে এল বোলতাটা। রঙটা ওর খয়েরী-হলুদ, তাতে কালো কালো ডোরা। আমায় দেখে সে ভয় পেলে না। খুবই সুস্থির হয়েই রইল। আমি ওকে দেখতে লাগলাম, সেও দেখতে লাগল আমায়।

সত্যিই ওটা ফেলিয়ার সংগ্রহের বোলতাটার মতোই দেখাত। ভেসে গেলাম আমি দূর অতীতে, মনে পড়ল ইশকুলের করিডরে পায়চারি করতে করতে অবিরাম আওড়ে যেতাম:

বোলতার রূপে রাজ-নন্দন
পাক দিয়ে উড়ে গেল বন-বন।

পুশকিনের লেখা রূপকথাটার এই ছত্রদুটো সারাক্ষণ লেগে থাকত আমার জিবের ডগায়, আর চোখের সামনে ভেসে উঠত মস্তো এক ক্রুদ্ধ বোলতার ছবি, আসলে যে হল যুবরাজ গ্‌ভিদন। বোলতা-রূপী গ্‌ভিদন তাড়া করে বেড়াচ্ছে বাবারিখা বুড়িকে, আর ক্ষীণদৃষ্টি ফেলিয়া কিনা তাকে ভালো করে নজর না করেই ভাবল বুঝি সাধারণ একটা বোলতা, পিন দিয়ে গে'থে রাখল ছিপিতে।

'কেন ওকে মারলি?' সখেদে তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম ফেলিয়াকে।

'আমি এই জিনিসটা ঢেলে দিয়েছিলাম, তাতে ব্যথা লাগে না...' কৈফিয়ৎ দিলে ফেলিয়া; কী একটা বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ-ছাড়া তরল পদার্থ দিলে শু'কতে, কীটপতঙ্গের ওপর ওই জিনিসটা ঢালে সে।

আজো পর্যন্ত গন্ধটা বেশ মনে আছে।

যাই হোক, আমার বর্তমানের বোলতাটি তালার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। পরিচয় হল আমাদের। এবার পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। ফেল্ট-ভরা গরম দোপাট্টা দরজার ভেতর বাসা পেতেছে সে। খড়খড়ে তক্তার ওপর কান রাখলাম — গুঞ্জন উঠছে দরজা থেকে। এই কর্কশ পালিশ-না-করা দরজাটা নিজের কামরায় নিয়ে গেলে বেশ হত! খাসা একটি বোলতা আর তার ছেলেপুলেদের সঙ্গে দিন কাটানো ভারি ভালো জিনিস। হয়ত মানুষের মধ্যে মিথ্যেটা ধরতে পারা আর তার চোখের তলে ধিক্কার চিহ্নের রামধনু দেগে দিতে পারার আশ্চর্য ক্ষমতা ধরে সব বোলতাই?

এক সময় অমনি একটি বিশ্বস্ত বোলতার খুবই প্রয়োজন ছিল আমার। লিজাকে যেদিন চুমু খাই, সেদিন সে ছিল অপরিহার্য। জীবনে সেই প্রথম বার। জানি না

ওটাকে আদৌ চুমু বলা চলে কিনা। শুধু তার তপ্ত, আশ্চর্য রকমের সোহাগভরা গালে ঠোঁট ঠেকিয়েছিলাম...

ভেবেছিলাম আমায় ঠেলে সরিয়ে দেবে নয়ত কড়া কড়া কথা শোনাবে। কিন্তু সরিয়ে দিল না আমায়। শুধু মাথা নুইয়ে কেবল ঠোঁট নেড়ে বললে:

'কী দরকার?'

আনন্দের বন্যায় আমার বাক-লোপ হয়েছিল। ফুলে ফেঁপে কূল ছাপিয়ে উঠল আনন্দ। হয়ত গোটা বিশ্বই ভরে উঠতে পারত তাতে, তবে আমিই ছিলাম তার একমাত্র ধারক, তাই আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম। শুধু ভাবনা হচ্ছিল কিছুই যেন না বদলায়, সময় যেন ফিরে না যায়, যেন না দাঁড়ায় যে আমি লিজাকে কখনো চুমুই খাই নি।

সবই যাতে না বদলিয়ে থাকে, তাই তাড়াতাড়ি চলে গেলাম।

আত্মহারার মতো চললাম রাস্তা দিয়ে। লাফাচ্ছিলাম এক ঠ্যাঙে। একবার হাতে ভর দিয়ে ডিগবাজিও খেয়ে নিলাম। এই সময় দেখা হল ফেলিয়ার সঙ্গে। সে সময় সে বড়ো হয়ে উঠেছে, ভালো পড়ুয়া ছেলে বলে নাম ছড়িয়েছে, নিজের প্রাধান্য জাহির করতেও কখনো ভুলত না। কিন্তু রাস্তায় যখন তার সঙ্গে দেখা হল, তখন ওতে কিছু এসে যায় না। ওকে পেয়ে আমি এমনই খুশি হয়ে উঠেছিলাম যে ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'তোর হয়েছেটা কী? মদ খেয়েছিস নাকি?'

একেবারে খাঁটি মরদের মতো আলাপ, আর মদ কখনো চেখে না দেখলেও আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল:

'আরে হ্যাঁ, হয়ে গেল রে... বন্ধুবান্ধবে মিলে এক পাত্র করে টানলাম।'

বিস্ময়ে লম্বা হয়ে গেল ফেলিয়ার মুখ আর 'যে-কোনো মুহূর্তে সে যে মারা যেতে পারে' তা ভুলে আমি তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম।

'ঝাঁকানি থামা তো!' রেগে, নাকের ডগায় নেমে-আসা চশমাটা ঠিক করে ফেলিয়া বললে, 'হলটা কী?'

খুশির হাতুড়ি পিটছিল আমার মাথায়। ফেলিয়ার কাছ ঘেঁষে এসে তাকালাম তার চশমায়।

'দিব্যি দিয়ে বল্‌ কাউকে বলবি না,' বললাম গোপনীয়তার সুর ফুটিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি দিতে রাজী হয়ে গেল ফেলিয়া। বললে:

'বেশ, বল তোর গোপন কথা।'

বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল সে, লম্বা লম্বা আঙুলে ক্রুশ-চিহ্ন দিলে পেটে।

'কসম খা!' জেদ ধরলাম আমি।

'বেশ, কসম!'

ওর কনুই ধরে আস্তে করে বললাম:

'জানিস ফেলিয়া, চুমু খেয়েছি ওকে।'

মুখের একটি পেশীও তার কাঁপল না। ভাবলাম, ফেলিয়া আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি, তাই আমার হাতে ঝাঁকুনি না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম:

'লিজাকে আমি ভালোবাসি রে ফেলিয়া, লিজাও আমায় ভালোবাসে। আমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছে।'

ঐন্দ্রজালিক এই কথাটি বলে চাইলাম ফেলিয়ার দিকে। ঠিক করলাম, আনন্দে ও যে চেঁচিয়ে উঠল না তার কারণ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মনে হল, দুনিয়ায় ওর মতো ভালো লোক আর হয় না। চেঁচিয়ে উঠলাম:

'ফেলিয়া, তুই এখন থেকে আমার সেরা বন্ধু! তোকেও আমি ভালোবাসি।'

এই সময় থেকে ফেলিয়া শুধু ফেলিয়া নয়, হয়ে উঠল আমার অমূল্য রহস্যের রক্ষাপাত্র।

ওহ্‌, বিজ্ঞ একটা বোলতার কী অভাবেই না সেদিন আমায় ভুগতে হয়েছিল, এমন বোলতা যে লোকের মিথ্যেটা ধরতে পারে, কথায় বিষ ঝরাতে দেয় না, অস্পৃশ্য দুরাত্মাদের নীল চোখের নিচে দেগে দিতে পারে তার ক্ষমাহীন রায়। সে সময় যদি ফেলিয়ার চশমার ভেতর থেকে চোখে পড়ত বোলতার রায় — লালচে-সবজে-বেগুনী ধনুক, তাহলে মুখ খুলতাম না। রহস্য রক্ষার অন্য পাত্র খুঁজে নিতাম। আরো বিশ্বস্ত।

পরের দিন লিজা নীরবে চলে গেল আমার পাশ দিয়ে।

'লিজা, নমস্কার! লিজা...'

গতি বাড়াল লিজা। আনন্দ আমার দ্রুত কমতে লাগল। কেমন যেন কুঁকড়ে গেল, মিইয়ে গেল।

এগিয়ে গিয়ে লিজার সঙ্গ ধরলাম। হাত টেনে নিলাম তার। ও হাত ছাড়িয়ে কেমন বিজাতীয় গলায় বললে:

'জানতাম না তুমি অমন একটা তুচ্ছ বড়াইবাগীশ। তোমায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আর তুমি দেখছি একেবারে ওঁছা।'

'লিজা, কী বলছ?!'

'যা বলছি, জেনে শুনেই বলছি। খুবই গুখোরি করেছি। বড়াই করার লোক পেয়েছেন ভালো — ফেলিয়া!'

নিবে গেল আলো। উলটে গেল দুনিয়া। ঠিক করলাম, ফেলিয়াকে খুন করব।

ভুলে গেলাম ও রুগ্ণ, অসুস্থ, শরীরচর্চা ওর মানা। করিডরে ওকে পাকড়াও করে জামা ধরে ঠেসে ধরলাম দেয়ালের সঙ্গে। গোল অ্যাকুয়ারিয়মে হুটোপুটি করছে দুটি ছেয়ে রঙের মাছ। আমার দৃষ্টি থেকে তারা পিছলে যাচ্ছে।

ও-ই কথা বললে প্রথম:

'তুই কী চাস, বল তো? আমি তো সত্যি কথাই বলেছি।'

ওর কথায় থ মেরে গেলাম।

'সত্যি মানে?!'

'কেন, সত্যি নয়? তুই যা বলেছিলি তাই বলেছি। নাকি চাস যে মিথ্যা বলব?'

প্রাণপণে ঠেসে ধরেছিলাম ফেলিয়াকে, ওর জামাটা পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল, তাহলেও আমার হাত থেকে খসে যাচ্ছিল সে।

'তুই যে কসম খেয়েছিলি কাউকে ফাঁস করবি না!' মরিয়ার মতো চেঁচালাম আমি, টের পাচ্ছিলাম মুঠো আমার আলগা হয়ে আসছে, ফেলিয়াকে ধরে রাখতে পারছি না।

'ওর কাছে তো এটা গোপন নয়।'

আমার হাত ছাড়িয়ে নিলে ও। দেবদূতের মতো ও অকলঙ্ক, আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম থুতু-খাওয়া, কাদামাখা। নিরস্ত্র, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিছুই করার নেই আমার। ফেলিয়ার দিকে সশঙ্কে তাকিয়ে আমি চলে গেলাম।

বোলতার উপকারিতা নিয়ে লোকে ভাবে কত কম! ভ্রূক্ষেপই করে না, নয়ত তাড়িয়ে দেয়, যেন ভীমরুল। অথচ লোকের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেবার জন্যে বোলতার খুবই দরকার।

বহু বছর পরে আমার ফের দেখা হয় ফেলিয়ার সঙ্গে। বুদ্ধিমান, গুরুত্বমনা লোকেদের যাতায়াত ঘটে থাকে যে করিডর দিয়ে, ভাগ্যক্রমে সেখানেই। বদলে গেছে ফেলিয়া। নেই আর সেই রুগ্ণ মুখ, চোখের নিচে কালি। হয়ে উঠেছে নিটোল, চিকন, চোপসানো গাল ভরে উঠেছে চর্বিতে। যে কাঁধে আগে সবকিছুই ঢল-ঢল করত, তা হয়ে উঠেছে গোলালো, শার্ট কোটের পক্ষে যুতসই। আর সাইকেলের পাম্প দিয়ে পাম্প করার মতো ফোলানো পেটটিতে তার চেহারায় লেগেছে বেশ একটা কায়েমী পাট্টার ভাব। লোকেও তাকে ডাকে এখন ফেলিয়া বলে নয়, ফেলিক্স।

দাঁড়িয়েছিল আমার দিকে একপেশে হয়ে, দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু তার একটা চোখ। পিছলে-যাওয়া ছাইরঙের মাছটা ভাসছিল গোল অ্যাকুয়ারিয়মে। বাঁকাভাবে ছাঁটা পাঁশুটে চুলের ঝুঁটি এসে পড়ছিল কপালে, ধীরে সুস্থে তা কায়দা করে ফের যথাস্থানে সরিয়ে দিচ্ছিল সে।

ভেবেছিলাম পাশ কাটিয়ে যাব, কিন্তু আমায় দেখে সে হাত বাড়িয়ে দিলে, আর মহানন্দে আমি দেখলাম তার দ্বিতীয় চোখটি ফুলে উঠেছে, চারপাশে তার ভারি চমৎকার এক রামধনু।

'কোথায় এটি জোটালি?' জিজ্ঞেস করলাম ফেলিয়াকে, টের পাচ্ছিলাম হাসতে শুরু করেছি।

'মানে, শহরের বাইরে গিয়েছিলাম আর কি... নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে একটা বোলতা... দিলে কামড়ে,' বিব্রতের মতো বলে ফেলিয়াও হাসতে শুরু করলে।

ওর হাসিটা শোনাল কাসির মতো।

মনে হল, 'আচ্ছা! স্পষ্টবক্তা বোলতার অভাব তাহলে এখনো হয় নি। আমার ফেলিয়াটিকে বোলতা ঠিকই চিনতে পেরেছে দেখছি।'

হাসা আমার উচিত নয়, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না, আকর্ণবিস্তৃত চাপা হাসিতে আমার ঠোঁটের কোণে ব্যথা করে উঠল।

'হাস্যকর ব্যাপার, তাই না?' তেতো মুখে জিজ্ঞেস করলে ফেলিক্স।

'আরে না,' বললাম জোর দিয়ে, 'তুই বুঝতে পারছিস না কী চমৎকার হয়েছে! কী আশ্চর্য রঙ, কী সূক্ষ্ম ঝিলিমিলি! একেবারে ওস্তাদের কাজ।'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল ফেলিয়ার। লম্বা হয়ে গেল মুখখানা:

'কী বলতে চাইছিস তুই?'

'আরে না, কিছু না। দেখা যাচ্ছে, খুবই বুদ্ধিমান বোলতা। তুই মেরেছিস ওটাকে?'

'তাতে আর লাভ কী?'

বুঝলাম, ফেলিয়া ওটাকে মারে নি। বললাম:

'জানিস, আমার একটা বোলতা আছে। থাকে গোলাঘরে। দরজার ফোকরে। ঢোকে তালার ফুটো দিয়ে...'

এমনি লাল হয়ে উঠল ফেলিয়া যে তার জ্বলজ্বলে রামধনুটাও ম্লান দেখাল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল সে। আমি কিন্তু তখনো কেবল মন খুলে আনন্দে হেসে যাচ্ছি।

'কী ব্যাপার গো, এত খুশি যে?' জিজ্ঞেস করলে নীল ওভার-অল পরা এক বুড়ি, 'লটারিতে মোটরগাড়ি পেয়েছ বুঝি?'

বললাম, 'উঁহুঁ, আরো বেশি, লড়াইয়ে জিতেছি।'

সভয়ে আমার দিকে চেয়ে বুড়ি জুতো খসখসিয়ে চলে গেল করিডর দিয়ে।

সন্ধ্যায় এলাম গোলাঘরে চুপি-চুপি, আমার ডানা-ওয়ালা বাসিন্দারা যাতে ভয় না পায়। দরজায় কান পেতে শুনতে লাগলাম। অবিরাম খুশির গুঞ্জন আসছিল সেখান থেকে। মনে হচ্ছিল যেন খুব জমজমাট একটা আলাপ। নিশ্চয় আমার পরিচিত বোলতাটি বলছিল কেমন নিখুঁতভাবে সে হুল ফুটিয়েছে ফেলিয়ার চোখে। অন্য বোলতারা তার এই কীর্তি আলোচনা করে খুবই তারিফ করছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে শুধু একটানা বোঁ-বোঁ করা একটা অক্ষরে — জজজ-জজজ-জজজ...



পালা বদল

'চলো বনে যাই। স্কী করব।'

'দিনটা স্কী করার মতো নয় রে। দেখ-না, কেমন ঝড় উঠেছে।'

'উঠুক গে ঝড়।'

'স্কীয়ের পথগুলো নিশ্চয় বরফে ঢেকে গেছে।'

'নতুন পথ কাটব আমরা। আমি যাব আগে-আগে। নাও, পোষাক পরো।'

'কালকে গেলে হয় না?'

'আমি গিয়ে স্কী নিয়ে আসছি, তুমি পোষাক পরে নাও।'

'বেশ।'

ছেলে তার জেদ ছাড়লে না। স্কী আনতে গেল সে, আর অনিচ্ছায় জুতো পরতে

লাগল বাপ। ঠান্ডা, কড়া জুতো, পশমের মোটা মোজা পরা পা তাতে কিছুতেই ঢুকতে চাইছিল না। তারপর বহুক্ষণ ধরে ফিতে বাঁধতে লাগল সে, যেন ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছে: ঠান্ডায় বেরতে চাইছিল না।

ছেলে ওদিকে স্কী নিয়ে, পোষাক পরে, এসে দাঁড়িয়েছে পাশেই, অধীর হয়ে এ-পা ও-পা করছে।

'হল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'নাও, চলো, বেরই...'

এমন আবহাওয়ায় গরম থেকে রাস্তায় বেরুনো মানে ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দেওয়া: তাপমাত্রার প্রচন্ড বদলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, কাঁপুনি ধরে গায়ে। চোখ কোঁচকালে বাবা, জোর হাওয়াটা থেকে মুখ ঘোরালে, আর ছেলে সতর্কের মতো দেখতে লাগল তাকে, ভয় হচ্ছিল এই বুঝি তার মত বদলাবে, বাড়ি ফিরে যাবে। বাপ কিন্তু ততক্ষণে বসে স্কী লাগাতে শুরু করেছে জুতোয়।

'আমি লাগিয়ে দেব?'

'না, তার দরকার হবে না। বাইন্ডিংটা খুব আঁটো... আবহাওয়া বটে...'

'হল?'

ভ্রূকুটি করছিল বাপ আর ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল ছেলে।

শেষ পর্যন্ত রওনা দিলে ওরা। ছেলে চলল আগে-আগে। স্কী করার পথ কাটছিল সে, যেভাবে বরফ-ভাঙা জাহাজ সমুদ্রে বরফ ভেঙে পথ করে দেয় ভারি ভারি জাহাজের। তাড়াতাড়ি করছিল সে, অনাবশ্যক দেহভঙ্গি করছিল অনেক। আর রক্ত গরম হয়ে উঠে নিশ্বাসের কষ্টটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত বাপ গুরুভার ভঙ্গিতে এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিয়ে স্কী করছিল।

'ঝড়ে কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না!' ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচাল ছেলে, 'এ বরং আরো ভালো।'

বাপ কোনো জবাব দিলে না। দম রাখার চেষ্টা করছিল সে। তুষার-ঝড় বইছিল ডান দিক থেকে; তার হিমেল ছোঁয়ায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে থুতনি। কী দায় পড়েছিল এমন আবহাওয়ায় বনে যাওয়ার!

খোঁচা খোঁচা তুষার-কণার ঝাপটা থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে ঘাড় নিচু করে স্কী করছিল বাপ। দেখতে পাচ্ছিল শুধু চকচকে দুটো ফালি — ছেলের পাতা স্কী-পথ। আর মাঝে মাঝে যখন মাথা তুলছিল, চোখে পড়ছিল ছেলের লম্বাটে, সামান্য নিচু-হওয়া বরফমাখা মূর্তি, এপাশ-ওপাশ দুলছে, ক্লান্তি নেই। মনে হবে যেন ওকে না থামালে ছেলেটা এক নিশ্বাসে তুষার-ঢিবি ভরা মাঠ বন পেরিয়ে সোজা এগিয়ে যাবে।

বাপ পেছিয়ে পড়ছে কিনা দেখবার জন্যে ছেলেটা মাঝে মাঝে ফিরে চাইছিল আর তখন তুষার-কণা জমা চোখের পাতার তল থেকে আনন্দে জ্বলজ্বলিয়ে উঠছিল চোখ।

এই ভাবেই ওরা পেঁছিল খাদ পর্যন্ত। ছেলে সেখানে থেমে অপেক্ষা করলে বাপের জন্যে। বাপ আসতে ছেলে বললে:

'এখান দিয়ে যেও না। ওই দিকে বাঁয়ে আছে নামার মতো ঢালু জায়গা।'

'আর তুই?'

'আমি কিন্তু এখান দিয়েই যাব।'

ছেলের দিকে চাইলে বাপ। এই সেদিন, বছর পাঁচেক আগে ওকে স্কী করতে শেখানোর কথাটা মনে পড়ল তার। ছেলে যাতে পড়ে না যায়, আঘাত না লাগে, তার জন্যে অল্প উঁচু একটা ঢিবি বেছেছিল সে। ছেলে কিন্তু আপত্তি করলে: 'আমি তো আর ছোটো নই!' জিদ ধরেছিল উঁচু ঢিবি বেয়ে নামবে। সে ছেলে এখন লম্বা হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের ওপরে দেখা দিয়েছে গাঢ় রোঁয়া। বাপকে সে বলছে: 'বাঁয়ের দিকে আছে নামার মতো ঢালু জায়গা'।

কী বলবে সে ছেলেকে? 'আমি এখনো বুড়ো হই নি'? কিংবা ওই ধরনের কোনো কথা?

আপন মনে হাসলে বাপ। ছেলের অপ্রত্যাশিত অভিভাবকত্বে খুশি লাগল তার, শান্ত হয়ে এল মন। হালকা লাগল তার গোটা শরীর, ইচ্ছে হল ঠিক এই খাড়াই পাড় দিয়েই সে নামবে। জোরে সে চেপে ধরল স্কীয়ের লাঠি, ঝুঁকে পড়ল সামনে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরপাক খেয়ে গেল তুষার-কণার বেঘোর ধবল ঘূর্ণিপাকে। আপনা

থেকেই বুজে এল চোখ, হাত এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পর মুহূর্তেই আর টাল সামলাতে পারল না। পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পাশে এসে দাঁড়াল ছেলে।

'লেগেছে?'

'না-না... কিছু হয় নি।'

বাপকে সে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলে, বরফ ঝাড়তে লাগল দস্তানা দিয়ে।

'কেন আসতে গেলে এখান দিয়ে?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আমি তো বলেইছিলাম যে বাঁয়ের দিকে নামার মতো ঢালু আছে। যাক-গে চলো এগোই।'

যে-পায়ের ওপর পড়েছিল সেটা ব্যথা করছিল। কিন্তু বাপ চাইছিল না সেটা ছেলের নজরে পড়ে। তাই তাড়াতাড়ি করে বললে:

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চল যাই, তুই সামনে এগো।'

অবলীলায় এগিয়ে গেল ছেলে, যেন ভেসে গেল বাতাসে, লম্বা দোলায় ঘন-ঘন হাত নাড়ছিল ডানার মতো, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি যদি সে একটা ভালো স্পীড নেয়, তাহলে মাটি ছেড়ে উড়ে যাবে কালো কালো ছুঁচলো-ডগা ফার গাছগুলোর ওপর দিয়ে।

সাবধানে বাপ তার দেহের ভার সরিয়ে আনলে অনাহত পা-খানার ওপর, লগি দিয়ে স্কী ঠেলার বদলে বরং তা লাগাচ্ছিল ঠেকা দেওয়ার কাজে। এগুতে অসুবিধা হচ্ছিল ওর, ব্যথা করছিল। তুষার-ঝড় কমে এসেছে। হিমেল শাদা মসলিন জড়িয়ে গেছে গাছের গুঁড়িতে, ঝোপঝাড়ের ডালপালায়। ফার গাছের কেশর থেকে তুষার উড়িয়ে ফেলছে না বাতাস। শান্ত হয়ে এসেছে বন।

সত্যিই বাঁদিকে যেখানে ঢালু ছিল সেখান দিকে এলেই ভালো হত নাকি? সে কথা ভাবতেই তার রাগ হল নিজের ওপর, ছেলের ওপর — সে ছেলে অনায়াসে, যেন দেহের ভার মুক্ত হয়ে পিছলে যাচ্ছে তুষারের ওপর দিয়ে, পেছনে বাপ কী ভাবে হাঁকপাঁক করে আসছে তাতে তার কিছুই এসে যায় না।

ভাবনাটা যেন টের পেয়েই থেমে গেল ছেলে। মুখ না ফিরিয়েই বললে:

'আরে, ওই শোনো।'

বাপ থেমে গিয়ে কান খাড়া করলে।

'শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা নাড়লে বাপ। নিজের বুকের শব্দ ছাড়া আর কিছুই সে শুনছিল না।

'টুপির ফিতেটা খুলে ফ্যালো,' পরামর্শ দিলে ছেলে।

দস্তানা খুলে বাপও বাধ্যের মতো আলগা করে দিলে টুপির ফিতে। সঙ্গে সঙ্গেই কান তার ভরে উঠল অজস্র ছোটো ছোটো ঘণ্টার চঞ্চল শব্দে। বাতাসের শন-শন আর বুকের ঢিপ-ঢিপ চাপা দিয়ে তা বাজছে সবকটা স্বরগ্রামে।

'কোথায় রে?'

'ওই ফার গাছটায়।'

পিরামিড আকারের যে উঁচু ফার গাছটার সামনে ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ কুঁচকে বাপ তাকাল সেদিকে। ডালগুলোর ওপর অসংখ্য চটপটে ছোটো ছোটো পাখি দেখতে পেলে সে। ক্রমাগত সেগুলো এ-ডালে ও-ডালে লাফালাফি করছে আর ঘণ্টাধ্বনির মতো কাকলি তুলছে একটু করে।

'জানো এগুলো কী পাখি?' জিজ্ঞেস করলে ছেলে।

বাপ মাথা নাড়লে।

'ছেয়ে গাইচ্কা,' বললে ছেলে, 'চলো যাই।'

টুপির ফিতে বাপ আর বাঁধলে না। কান পেতে রইল, অমনি একটা ফার গাছ আরো পড়ে কিনা। কিন্তু হাঁটাপথটা বরাবর ফার গাছগুলোই সবই শব্দহীন। তাছাড়া ব্যথা করছিল হাঁটুতে। যাচ্ছিল সে মাথা নিচু করে, চেষ্টা করছিল যথাসম্ভব সুস্থ পা-টা চালাতে।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল ছেলে থেমে গেছে, লক্ষ করছে ওকে।

'হাঁপিয়ে গেছ?' বাপকে চাইতে দেখে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা।

'উঁহু, আর তুই?'

জবাব না দিয়ে ছেলে মৃদু হাসলে। তারপর বললে:

'তুমি এখানে, এই পথটায় একটু দাঁড়িয়ে থাকো। ইচ্ছে হলে সিগারেট খেয়ে নাও।'

বাপ দাঁড়িয়ে রইল আর স্কীয়ের তলে ফুঁয়ো-ফুঁয়ো উঁচু তুষার-স্তূপ দলিত

করে বনের গভীরে চলে গেল ছেলেটা। লগিতে ভর দিয়ে বাপ চেয়ে রইল সেদিকে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝলক দিচ্ছিল ছেলের কুঁজো-পানা মূর্তিটা।

কী যেন খুঁজছিল ছেলেটা। তারপর এক জায়গায় থেমে গিয়ে উবু হয়ে বসে বরফ সরাতে লাগল হাত দিয়ে।

'কী খুঁজছিস?' চেঁচালে বাপ, 'গুপ্তধন নাকি?'

'হ্যাঁ!.. তুমি একটু জিরিয়ে নাও।'

বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল বাপ, জখম পা-টায় আলগা দিলে। ব্যথা করছে হাঁটুতে, জ্বলছে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেকে দেখা গেল হাঁটাপথটার ওপর। দস্তানা চেপে রেখেছে দাঁত দিয়ে, স্কীয়ের লগি বগলে। ঠান্ডায় লাল-হয়ে-ওঠা দু'হাত অঞ্জলি করা। তাতে করে কী যেন দিয়ে আসছে সে, নিয়ে আসছে সাবধানে, প্রদীপ নিয়ে আসার মতো। বাপের কাছে এসে সে হাত বাড়িয়ে দিলে। তাতে বেগুনী একটি বিন্দু।

'কী এটা?'

'ভায়োলেট ফুল।'

তাকিয়ে দেখলে বাপ। সুতোর মতো সরু সবুজ বোঁটায় ছোট্ট তাজা একটি ফুল।

'কোত্থেকে খুঁড়ে তুললি?'

'ফার গাছের নিচে, বরফ থেকে। আরো নিয়ে আসতে পারি।'

'থাক, দরকার নেই। দস্তানা পরে নে, হাত তোর জমে গেছে।'

'ছাই! নাও এটা।'

সাবধানে ফুলটা নিলে বাপ। তুলে ধরলে চোখের কাছে, তারপর মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে, ঠান্ডা পাপড়িগুলো একটু গরম হোক।

'শীতকালে তুমি ভায়োলেট খোঁজো নি কখনো?' হাতে দস্তানা টেনে চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা।

'না।'

কিছুই বললে না ছেলে। লগি হাতে নিয়ে আস্তে ঠেলা মারলে। আর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল বাপ, ভেবে পাচ্ছিল না ভায়োলেটটা নিয়ে কী করবে, জখম

পায়ে ভর দেবারও সাহস হচ্ছিল না। ওর মনে হল, এই বুঝি ছেলেটা চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে, ও পড়ে থাকবে একলা। মুহূর্তের জন্যে একটা তিক্ত জ্বালায় আচ্ছন্ন বোধ করে সে।

'কী হল বাবা?' মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা।

'কিছু না, কিছু না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলে সে, 'এক্ষুনি আসছি... কিন্তু ফুলটা রাখি কোথায়?'

'ঠোঁটে চেপে রাখো,' বলে এগিয়ে গেল সে।

চলছিল ও হেলে দুলে, যাতে তার পাল্লা ধরতে বাপের অসুবিধা না হয়। বাপও খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল তার পেছু-পেছু। লম্বা-হয়ে-ওঠা কুঁজো-পানা এই যে ছেলেটা তাকে পাখির গান শুনিয়ে, বরফ থেকে ভায়োলেট ফুল তুলে দিয়ে, পেছন-পেছন আসতে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্যে ধীরে ধীরে চলে তার যন্ত্রণা ভোলাবার চেষ্টা করছে, তার প্রতি একটা নতুন অনুভূতি টের পেল সে। জীর্ণ জুতো, না-ধোয়া হাত, কম-পাওয়া নম্বরের অভ্যস্ত জগত থেকে সহসা বেরিয়ে এসে ছেলে বাপের সামনে দাঁড়িয়েছে একটা আশ্চর্য নতুন আলোয়, বরফের মধ্যে ফুলটার মতোই যা ভারি অপ্রত্যাশিত।

'হাঁপিয়ে যাও নি তো বাবা?'

'না।'

'তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। প্রায় এসে পড়েছি। ঝড়ও কমে এসেছে।'

বন থেকে বেরিয়ে তারা এবার যেতে লাগল সমতল মাঠের ওপর দিয়ে। একজন সংযত করে রেখেছে তার উদ্দাম ধাবন, অন্যজন খোঁড়াচ্ছে তার জখম পায়ে।

বাড়ির কাছে এসে বাপ বললে:

'কাল ফের স্কী করতে যাব, কী বলিস?'

'কাল হবে না,' বললে ছেলে, 'কাল আমরা ছেলেরা যাব দল-বেঁধে।'

দোষী-দোষী ভাব করে বাপ হাসলে:

'তাহলে অন্য আরেক দিন...'

মাটি-ঘেঁষে হালকা একটা বাতাস বইছিল বরফ-ঢাকা মাঠে। মনে হয় সে বরফের গভীরে কোথাও যেন গরম রয়েছে, ভাপ উঠছে তুষার-কণা ফুঁড়ে।



স্কেট্‌স্‌ বগলে ছেলেটা

১

মার্চ মাসের রোদ-ঢালা দিনে শহরের কার্নিস-পাইপের ঝুলন্ত বরফ গলতে শুরু করে। রুগ্‌ণ শীতার্ত মাটিকে তারা ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ খাওয়ায়।

স্কেট্‌স্‌ নিয়ে একটি ছেলে হেঁটে যাচ্ছে।

ছেলেটা রোগা, ঢ্যাঙা। কিছুই ওর মাপসই নয়। সবই ছোটো। স্কী করার ট্রাউজারটা গোড়ালি অবধি। ওভারকোট কোনোক্রমে হাঁটু পর্যন্ত। হাত পকেটে

ঢোকানো, কিন্তু কব্জিটা আঢাকা, হাওয়ায় লাল হয়ে উঠেছে: আস্তিনটা খাটো। গলাটাও তার লম্বা, রোগা। মাফলারে তা ঢাকা পড়েছে মাত্র আধখানা। ডোরাকাটা সবুজ রঙের মাফলার, আর তার সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জায়গাটিতেই বেগুনী কালির দাগ।

মনে হবে যেন গতকাল তার পোষাক সবই মাপসই ছিল, কিন্তু রাতারাতি খুবই বেড়ে উঠেছে, নতুন পোষাক কেনার সময় পায় নি।

হাত ওর পকেটে ঢোকানো, স্কেট্‌স্‌ জোড়া বগলের তলে।

কেমন যেন ও বেঢপ, নড়বড়ে। সমতল জায়গাতেই হোঁচট খাচ্ছে, ধাক্কা লাগছে পথচারীদের সঙ্গে, কখনো ছুটছে লাফাতে লাফাতে, কখনো গাড়ি দেখে থেমে যাচ্ছে রাস্তার মাঝখানটাতেই। চোখ ওর সবুজ, মারমুখী।

বখাটে চাউনি আর বেপরোয়া ভঙ্গিতে ওকে মনে হয় ছটফটে ডানপিটে, ছেলেপিলেদের মধ্যে থাকলে যে বেশ চালায়, কিন্তু একলা পড়লে ভেবে পায় না কী করবে।

ওভারকোটের একটা বোতাম নেই। খানিকটা কাপড় সমেত তা ছেঁড়া। একেবারে জীর্ণ টুপিটায় একটা কান ঢাকা পড়েছে, অন্য কানটা ঠান্ডায় অনাবৃত। খুলে-আসা জুতোর ফিতে লোটাচ্ছে ফুটপাতে: ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

বগলদাবা স্কেট্‌স্‌ জোড়াটাই শুধু তার নিখুঁত, পরিপাটী। কালো জুতোর সঙ্গে তা পেতলের রিভেট দিয়ে আঁটা। জুতো জোড়াও ঠিক 'স্যান্ডউইচ' করে চামড়ার কালো বেল্টে বাঁধা। এ কোনো মেয়েলী 'তুষার-কন্যা' স্কেট্‌স্‌ নয়, রীতিমতো গুরুগম্ভীর পুরুষালী 'ব্রিটিশ স্পোর্টস' স্কেট্‌স্‌। ছুঁচলো মজবুত তার ডগা।

তা পরে ছোটার সময় বরফের গুঁড়ো ঠিকরোয় নানা দিকে, যেভাবে ফুলকি ছোটে ঘোড়ার নালে। জোর ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একেবারে থেমে যাওয়া যায়, অনেকখন পিছলে যাওয়া যায় রিঙ্কের বরফে।

এই পরিপাটী, সযত্ন-রক্ষিত স্কেট্‌স্‌ জোড়ার সঙ্গে একেবারেই মানায় না তার বোতাম-ছেঁড়া খাটো ওভারকোট আর এক কান ঢাকা জীর্ণ টুপিটা।

বরফ-গলা ঠাণ্ডা এক ফোঁটা জল পড়ল ছেলেটির গালে। খোলা হাতটা দিয়ে সেটা সে মুছল, তারপর গলন্ত বরফটার দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চেয়ে ঢুকে গেল গলিতে।

২

ইশকুলে যারা পড়ে তাদের এখন বাসন্তী ছুটি, বড়োদের কিন্তু ছুটি নেই। রাস্তায় তাই লোক কম। আর গলিতে এমনিতেই পথচারী দেখা যায় কম।

পুরনো গলি, দোতালা সব বাড়ি। বরফের চটায় পথ ঢাকা। বরফ সাফ করার গাড়িগুলো এখানে গোটা শীতের মধ্যে উঁকি দেয় নি একবারও। দেখেই বোঝা যায় ছোট্ট এই গলিটা হল শহরের বড়ো বড়ো সদর রাস্তার খুবই দূরের আত্মীয়।

স্কেট্স্ বগলে ছেলেটা হাঁটছে গলি দিয়ে। টুপিটা সে সরিয়ে দেয় ঠাণ্ডা-হয়ে-আসা অন্য কানটায় — এবার তোর পালা, গরম হয়ে নে! — তারপর কান পেতে শোনে। শোনে বাজনা। স্টেডিয়ম থেকে তা ভেসে আসছে। বড়ো রাস্তায় তা গাড়ির শব্দে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু গলিটা চুপচাপ, তাই বাজনা শোনা যাচ্ছে। ছেলেটার ওপর তার প্রভাব হয় ঠিক যুদ্ধের বিউগল সঙ্কেতের মতো। আপনা থেকেই গতি বাড়িয়ে দেয় পা, খুলে-আসা ফিতেটা কেবলি টোকা মারে জুতোর গায়ে। ভারি ভালো হয় যদি ফুঁয়ো-ফুঁয়ো লাল সোয়েটার আর খাটো নীল স্কার্ট পরা মেয়েটা ফের স্কেটিং রিঙ্কে আসে! সেই মেয়েটি, মাথায় যার ফারের শাদা টুপি। ককেসীয় টুপির মতো উঁচু। টুপির তল থেকে বেরিয়ে থাকে দুটি বেণী। বেণী ধরে একবার টানতে পারলে বেশ হয়! কিন্তু মেয়েটা এতই গুমরে আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে তা করার সাহস হয় নি। মেয়েটার চোখের সামনে সে তিনটে ছেলের মাথা থেকে টুপি উড়িয়ে দেয়। একটা ছেলে তো একেবারেই বড়ো। ওর চেয়ে এক বিঘত লম্বা। ও-রকম ছেলের কাছ থেকে চাঁটি খাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই। মেয়েটার বেণী ধরে টানার সাহসে না কুলালে আজো সে ছেলেটার টুপি খসাবে... কিন্তু মেয়েটা যদি এর মধ্যেই রিঙ্কে এসে গিয়ে থাকে? হয়ত স্কেট্ করতে শুরু করেছে তার রূপোলী 'তুষার-কন্যায়'? আর বড়ো ছেলেটা যদি হঠাৎ টান মারে তার বেণীতে?!

স্কেট্‌স্‌ বগলে ছেলেটা আর হাঁটছে না, স্রেফ দৌড়চ্ছে। দেরি যেন না হয়! দেরি না হলেই বাঁচি!

এই সময় গলির শেষে দেখা গেল একটা লোক। এমনিতে ছেলেটা সেদিকে নজরই দিত না, কিন্তু লোকটাই হল গলির একমাত্র পথচারী, আসছিলও সোজা সামনে থেকে। লম্বা দশাসই চেহারা। পরনে চামড়া-বাঁধানো শাদা ফেল্ট বুট, কী একটা কালো জানোয়ারের ছাল দিয়ে তৈরি লম্বা চওড়া কোর্তা। পা ফেলছে কেমন ভারি-ভারি, থেমে থেমে। আর ছেলেটা ওদিকে প্রায় ছুটছিল, তাই শিগগির তাদের মুখোমুখি হওয়ার কথা।

হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। তারপর সামনে টলে গিয়ে এলোমেলো কয়েকটা পা ফেললে, মনে হল এই বুঝি পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না লোকটা, পায়ের ওপরেই খাড়া রইল। অসহায়ের মতো সে হাত নাড়তে লাগল, যেন শূন্যে কোনো একটা অদৃশ্য জিনিসে ভর দিতে চাইছে। এবার সে নিশ্চিতই পড়ে যেত, তবে ঠিক সময়েই বাড়ির দেয়ালটায় হাত দিতে পারল সে।

‘নিশ্চয় মাতাল,’ ভাবলে ছেলেটা। চোখে ওর ঝিকিয়ে উঠল বিদ্বেষের সবুজ ছটা: মাতাল সে সইতে পারে না।

ঘেন্নায় নাক কুঁচকে সে গতি বাড়িয়ে দিলে যাতে তাড়াতাড়ি লোকটাকে ছাড়িয়ে যায়।

ছেলেটা যখন লোকটার কাছে এসে পড়ল, তখন সে প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে। মুখের কাছে গভীর দুটো ভাঁজ ফুটে উঠেছে। নিশ্বাস ফেলছে হাঁপিয়ে।এক হাতে দেয়াল ধরে আছে আর অন্য হাত দিয়ে কলারের লোহার হুক খোলার চেষ্টা করছে। হুকটা খুব আঁটো, ফাঁস থেকে তা আলগা করার মতো জোর নেই হাতে। কপালে ফুটে উঠল বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও থেমে গেল ছেলেটা। এই সময় চোখ মেলে লোকটা চাইল তার দিকে। ঝুলন্ত ভুরুর তলে অনেক দূর কোত্থেকে যেন সে দৃষ্টি আসছে। না, মাতালের ঘোলাটে ক্ষ্যাপাটে চোখ এ নয়। যন্ত্রণা আর উদ্বেগে তা ভরা। প্রকাণ্ড এই পুরুষ্টু লোকটার সমস্ত ভাবটা থেকেই ফুটে উঠছিল অসহায়তার অস্বস্তি।

শেষ পর্যন্ত হুকটা খুলতে পারল সে। ক্লান্ত হাত এলিয়ে নেমে এল নিচে, নিজের ভারেই নুয়ে এল কাঁধ। চোখ বন্ধ করলে লোকটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা খুললে। ছেলেটাকে দেখতে পেয়েছিল সে, চাইছিল না তার দৃষ্টিপথ থেকে সে হারিয়ে যায়।

তখনো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা। সময় নেই তার। ভয় হচ্ছিল দেরি হয়ে যাবে। টেনে টেনে নিশ্বাস নেওয়া লোকটার দিকে চাইছিল নিষ্করুণ সবুজ চোখে।

চুপ করে রইল লোকটা। বুকটা তার ভারাক্রান্তের মতো ফুলে উঠছিল, তারপর নেমে আসছিল ধীরে ধীরে, যেন ভয় পাচ্ছে তীক্ষ্ম কিছু একটাতে খোঁচা লাগবে। সবেমাত্র লোহার হুকটা খোলার পর আঙুলগুলো এখন বোতাম খুলছে।

চুপ করেই আছে লোকটা।

ছেলেটার মনে পড়ল একবার রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায় এক বুড়োর। ফুটপাথে পড়ে পড়ে আস্তে কাতরাচ্ছিল সে। খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার, আর চারিপাশে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল লোকেরা। অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত তারা কেবল চেয়েই রইল অভাগা লোকটার দিকে।

কাছেই একটা অচেনা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বোধ হয় এ লোকটারও বিচ্ছিরি লাগছে?

হঠাৎ লোকটা বললে:

'খোকা রে...'

ওই একটা কথা বলেই সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল। বোঝা যায়, বাকি কথাগুলো উচ্চারণ করা তার শক্তিতে কুলাল না।

'খোকা রে' কথাটা শুনে ছেলেটা হতভম্বের মতো তাকাল লোকটার দিকে। 'খোকা রে' বলে তাকে ডাকে তার মা। ওটা মায়ের কথা। পুরুষের মুখ থেকে ও ডাকটা শুনল এই প্রথম।

অচেনা লোকটা ফের তার শক্তি জড়ো করে বললে:

'আমায় একটু বাড়ি পৌঁছে দে-না... এই কাছেই।'

নীরবে ছেলেটা তার কাঁধ বাড়িয়ে দিলে। অনিশ্চিতের মতো লোকটা দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে ভর দিলে ওর কাঁধে। লোকটা প্রকান্ড, ভারি, আর ছেলেটা রোগা, নড়বড়ে। লোকটা চেষ্টা করছিল বেশি ভর না দিতে। রাস্তা দিয়ে এগ্‌ল ওরা।

ছেলেটার খেয়ালও ছিল না যে সে অনবরত গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। রিঙ্ক থেকে মধ্‌র বাজনা এসে লাগছে কানে। হাতছানি দিচ্ছে, ডাকছে, তাড়া দিচ্ছে সে বাজনা। ছেলেটার মনে হল তার একেবারেই দেরি হয়ে যাবে, পাঁচ মিনিট পরে পেঁছিলেও শেষ হয়ে যাবে সব। বরফ, বাজনা, ছ্‌টন্ত ছেলেগ্‌লোর সারি — কিছ্‌ই থাকবে না...

ওদিকে পা ফেলতে খ্‌বই কষ্ট হচ্ছিল র্‌গ্‌ণ লোকটার। প্রতিটি পদক্ষেপেই ব্‌কে লাগছে। তার অস্থির গাইডটি থেকে পেছিয়ে পড়তে চাইছিল না, কিন্তু সামর্থ্যে কুলচ্ছিল না। কয়েক বারই সে থামল দম নেবার জন্যে। সে সময় সে টের পাচ্ছিল যে ছেলেটা ছটফট করছে তার হাতের নিচে, অধীর হয়ে ফিরে তাকাচ্ছে। রোগী বা ছেলেটা, সারা রাস্তা কেউ একটি কথাও কইলে না। ওদের যোগাযোগ একটা দ্‌র্ঘটনার ফলে। একজন অপরের কাছে বোঝা। সেটা ব্‌ঝতে পারছিল ওরা, তাই দ্‌'জনেই চাইছিল তাড়াতাড়ি ছাড়া পেতে।

শেষ পর্যন্ত একটা নিচু দেউড়ির কাছে থামল ওরা। বোঝা গেল এইটেই শেষ হল্ট। কপাল থেকে ঠান্ডা ঘাম ম্‌ছে ফেললে লোকটা, তারপর বিশেষ কারো উদ্দেশে নয়, যেন নিজের মনেই বললে:

'নড়ে উঠেছে টুকরোটা। এত বছর নিশ্চিন্দি, তারপর হঠাৎ!'

বোঝা যায় ছেলেটার কাছে সে নিজেকে দোষী মনে করছে, তাই কিছ্‌টা দোষ চাপাতে চাইছে 'নড়ে-ওঠা টুকরোটার' ওপর।

সচকিত হয়ে উঠল ছেলেটা, অবিশ্বাসের দ্‌ষ্টিতে চাইল লোকটার দিকে।

'কিসের টুকরো?'

'টুকরো যেমন হয় ভাই, শেলের টুকরো... কবে য্‌দ্ধ শেষ হয়েছে, টুকরোটা কিন্তু রয়েই গেল,' বলে নিজের ব্‌কটা দেখাল সে।

দেয়ালে ভর দিয়ে তখনো সে দাঁড়িয়েই থাকছিল আর মন দিয়ে ছেলেটা লক্ষ

করছিল ওকে। নাক, ঠোঁট, গভীর টোল খাওয়া থুতনি — সবই লোকটার বড়ো-বড়ো। গালে খড়খড়ে দাড়ি।

'যাওয়া যাক তাহলে,' দেউড়ির দরজা খুলে বললে লোকটা, 'খুবই ভারি এক সৈন্য জুটেছে তোর কপালে।'

এগিয়ে গেল ওরা।

৩

সিঁড়িতে ওঠার সময় লোকটা ভয়ানক ভর দিলে ছেলেটার কাঁধে। অন্য হাতে জোরে আঁকড়ে ধরলে রেলিঙ, যেন ভয় পাচ্ছিল সিঁড়ির ধাপটা বুঝি পায়ের নিচে তলিয়ে যাবে। কষ্ট হচ্ছিল ওর। আর খুবই চাপ লাগছিল ছেলেটার। তবে দু'জনেই সহ্য করে গেল। লোকটার বুকের মধ্যে নড়ে-ওঠা টুকরোটার কথা ভাবছিল ছেলেটা, একবার তার কেমন মনে হল যেন সদ্য-ফ্যাটা এক শেলে আহত কোনো যোদ্ধাকেই সে নিয়ে যাচ্ছে। আর লোকটা ভাবছিল তাড়াতাড়ি বিছানায় পৌঁছতে পারলে হয়।

বাড়িতে এসে লোকটা ফারের কোর্তাটা খুলতে লাগল। এতই তাতে তার পরিশ্রম হচ্ছিল যেন ওটা কমসে কম দু'মন ভারি।

অবশেষে খালাস হল সে বোঝা। নিচে দেখা গেল ফৌজী শার্ট আর নীল ট্রাউজার। শার্টের ডানদিকে পকেটের ওপর গ্যালুনের ব্যান্ড শেলাই করা। গুরুতর জখমের চিহ্নস্বরূপ এই ব্যান্ডটায় প্রমাণ হচ্ছিল লোকটা পুরনো ফৌজী রোগে ভুগছে।

লোকটা যখন পোষাক ছাড়ছিল, ছেলেটা তখন দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাকে। নিজে সে ওভারকোট খুললে না, যে-হাতের কনুই দিয়ে সে 'ব্রিটিশ স্পোর্টস' স্কেট্‌স্ চেপে রেখেছিল সেটাকেও বার করলে না পকেট থেকে।

ধপ্ করে লোকটা বসল সোফায়, যেন প্রায় পড়েই গেল। সকাতরে ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল পুরনো স্প্রীঙগুলো। পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলে লোকটা।

ছেলেটা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল তার সামনে। হতভম্ব হয়ে সে ভেবে পাচ্ছিল না এ অবস্থায় কী করার কথা। সামনে তার রোগী। ঠাণ্ডা লাগা কী ইনফ্লুয়েঞ্জা নয় —

বুকে-টুকরো-বেঁধা প্রবীণ যোদ্ধা। সামনে যা-কিছুই পড়ুক অসঙ্কোচে তাকিয়ে দেখতে ছেলেটা অভ্যস্ত, এখন কিন্তু তার সবুজ চোখ থেকে মুছে গেল সেই বেপরোয়া আত্মবিশ্বাস। স্কেটিং রিঙ্কে যাবার পথে গলির মধ্যে ভাগ্যচক্রে যে-লোকটার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

চোখ বুজে লোকটা কতক্ষণ পড়ে ছিল বলা কঠিন। যখন সে চোখ মেললে তখনো ছেলেটা তার সামনে দাঁড়িয়ে: বোতাম-ছেঁড়া খাটো ওভারকোট, এক কান ঢাকা টুপি, বগলে স্কেট্‌স্।

'এখনো তুই এখানে?' প্রায় ঠোঁট না নেড়েই বললে জখম লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'তুই যা এবার। আমি নিজেই দেখে নেব... সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।' এক ঢোক বাতাস গিলে লোকটা শুধাল, 'তাড়া আছে তোর, না?'

ছেলেটার বগলে স্কেট্‌স্ জোড়া তার নজরে পড়ল কেবল এতক্ষণে।

'হ্যাঁ, আছে!' ছোট্ট এই দুটো শব্দ খসারই কথা ছিল ছেলেটার মুখ থেকে, কিন্তু তার বদলে শোনা গেল একেবারে অন্য জবাব:

'না-না, তাড়া নেই আমার... স্কেটিং করা আমার হয়ে গেছে।'

নিজেই তার অবাক লাগল যে সে ঠিক এই কথাই বলে ফেলেছে, এবং এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে যেন ব্যাপারটা সত্যিই তাই। নিজেই এ কথা বলে ফেলায় দুঃখ হল তার, কিন্তু ফেরা আর চলে না।

'আপনার নিজের লোকেরা কেউ না আসা পর্যন্ত আমি থাকছি, তারপর যাব।'

ওর মনে হল এ সব কথা যেন ও বলছে না, ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য কেউ। নিজেরই আফসোস হল তার: বাড়ির লোকেরা কখন আসবে কে জানে। হয়ত তাড়াতাড়ি নয়। সন্ধ্যায়।

'কেউ আসবে না,' একটু চুপ করে থেকে বললে লোকটা, 'ছেলেকে নিয়ে বৌ গেছে তার মায়ের কাছে। ইশকুলের ছুটি কাটাতে। সাপোজকে*।'

---

* সাপোজক্ কথাটায় রুশীতে হাই বুটও বোঝায়।

'কোন সাপোজকে?' মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটার।

কণ্ঠে একটু হাসি ফুটল লোকটার, বুঝিয়ে বললে:

'আরে, ওটা একটা শহর। ছোট্ট শহর, রিয়াজান এলাকায়।'

স্কেট্‌স্‌ জোড়া ছেলেটা চেয়ারে রাখলে। এতে করে সে যেন বুঝিয়ে দিলে কোথাও যাবার তার তাড়া নেই।

নবপরিচিতের দিকে গম্ভীরভাবে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করলে:

'কী করা যায় তাহলে?'

'আরে, এটা কিছু না। শুয়ে থাকব, কেটে যাবে,' বললে গৃহকর্তা, তারপর ঠিক যেন ছেলেটার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে যোগ দিলে, 'মানে, কারখানায় কাল রাতেই শরীরটা কেমন করছিল। কিন্তু অসুখে পড়ার ফুরসুত কোথায় সেখানে! চরকি-লেদ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করতে হল... সকালে একেবারেই কাবু হয়ে পড়লাম। তবু ভাবলাম, যে করে হোক বাড়ি পেঁছে যাব। তারপর তো এই...'

চোখ বন্ধ করে ও চুলে হাত বোলালে। বোঝা যায় একটু নরম পড়েছে যন্ত্রণাটা, তাই আলাপ চালিয়ে গেল:

'এটা জানিস, ঝেড়েছিল ওরেল শহরের কাছে। পাঁচটা টুকরো বার করেছে, একটা থেকেই গেল।'

'কিন্তু কে... ঝাড়লে?' যোদ্ধার বুলির সঙ্গে তাল দিয়ে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা।

''ফের্ডিনাণ্ড', জার্মান ট্যাঙ্ক... এ.টি.সি. কী জিনিস জানিস?'

মাথা নাড়লে ছেলেটা।

'ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান,' বোঝালে প্রাক্তন যোদ্ধা, 'পঞ্চান্ন মিলিমিটার বোর। ছুঁচোর মতো আমরা মাটিতে গর্তে সেঁধিয়ে আছি, ওদিকে ট্যাঙ্কগুলো আসছিল সোজা আমাদের দিকে। দুটোতে আমরা আগুন ধরিয়ে দিই, কিন্তু তিন নম্বরটা আমাদের ঝাড়লে... আমাদের টীমটা, কামানটার কোনো পাত্তাই রইল না... যাক গে, ঠিক হয়ে যাবে। শুয়ে থেকে সেরে যাব...'

হঠাৎ ফের ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে, মুখের ভাঁজদুটো হয়ে উঠল আরো গভীর।

'ডাক্তার ডেকে আনব?' বললে ছেলেটা।

মাথা নাড়লে লোকটা। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তাহলেও শেষ পর্যন্ত বললে:

'ডাক্তার ডেকে লাভ নেই। বরং ওষুধ যদি আনতে পারিস... যদি তোর খুব তাড়া না থাকে।'

'তাড়া নেই,' বললে ছেলেটা, 'কোথায় প্রেসক্রিপ্শন?'

'টেবিলে। পাশের ঘরে। মাঝের দেরাজটা খুলবি। সেখানেই কোথাও গড়াচ্ছে। যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ।'

৪

ছেলেটার নাম জিজ্ঞেস করে নি লোকটা, নিজের নামও বলে নি। আর নিজে থেকে জিজ্ঞেস করবে, সে সাহস হয় নি ছেলেটার।

অন্য ক্ষেত্র হলে অচেনা এক পরের বাড়িতে এভাবে থাকতে ছেলেটার ভারি বিচ্ছিরি লাগত। কিন্তু বেশি যন্ত্রণায় যেমন কম ব্যথাটা চাপা পড়ে যায়, তেমনি যে-উদ্বেগ তাকে ক্রমাগত চেপে ধরছিল তাতে অস্বস্তিটা আর টেকে নি। তাই বিশেষ দ্বিধা না করেই সে পাশের ঘরের দরজা খুললে।

হলুদ রোদের আভায় ঘরখানা ভরা। যেন সত্যিই একরকমের জ্বলজ্বলে হলুদ রঙ, যা মেঝেতে, দেয়ালে, বইয়ের তাকে, এমনকি গ্লোবটাতে কখনো শুকিয়ে উঠতে পারে নি। চোখ কোঁচকালে ছেলেটা — রোদ্-রঙ ছিটকে পড়েছিল তার চোখে — কানে এল টাইপ-রাইটারের ধাতব খট-খট শব্দ। আসলে জানলার ওপাশে টিপটিপিয়ে বরফ-গলা জল পড়ছিল জানলার লোহার কার্নিসে।

জখম লোকটা এখন যে-ঘরে শুয়ে আছে, বসন্তের রোদ-ঢালা এ ঘরখানা মোটেই সেরকম নয়। গৃহস্বামীর কী হয়েছে, ঘরখানা বোধ হয় এখনো তা জানে না, তাই দিলখুশ মেজাজ তার। জানে না ক্যালেণ্ডারটাও; আজকের পাতাটায় এনগেজমেণ্ট লেখা: 'বেলা ৪টেয় পার্টি কমিটি'।

টেবিলের কাছে এল ছেলেটা। কিন্তু মাঝের দেরাজটা টানার আগে তার চোখে পড়ল দুটো খাতা আর একটা পাঠ্যপুস্তকে — ষষ্ঠ শ্রেণীর 'পদার্থবিদ্যা'। আর

খাতায় তাদের মালিকের নাম লেখা: সের্গেই বাখ্‌তিউকভ, ৬ষ্ঠ 'ক'। এই সের্গেই তাহলে রিয়াজানের সাপোজক শহরে তার মায়ের সঙ্গে ছুটিতে গেছে দিদিমার কাছে।

ছেলেটার চোখ জ্বলে উঠল অসন্তোষের ছটায়। খাতা ঠেলে দিয়ে সন্তর্পণে সে খুললে মাঝের দেরাজটা।

কাগজপত্র, নক্সা, ফোটোগ্রাফ আর এমন সব রকমারি জিনিসে দেরাজটা আগাগোড়া ঠাসা, প্রথম দেখে যা মনে হবে একান্ত মূল্যহীন। যেমন, কী মানে হয় ওই প্রশ্নচিহ্নের মতো বাঁকা তামাকের পাইপটার, অথবা ঘড়ির একটা পুরনো চেন, কিংবা প্যাকেটে-মোড়া ব্লেডগুলোর?

প্রেসক্রিপ্‌শনটা খোঁজার সময় ছেলেটা পরের এই জিনিসগুলোয় নজর দিতে চাইছিল না, কিন্তু ওরা তাকে টানছিল চুম্বকের মতো। পাইপটা হাতে নিলে সে। পোড়া-পোড়া গন্ধ ছাড়ছিল তা থেকে। নিশ্চয় সৈন্যটি তার ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের কাছে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মতো এই পাইপ টেনেছিল ফ্রন্টে। পাইপের গন্ধটা শুঁকে ছেলেটা তা আবার সাবধানে রেখে দিলে। তারপর গৃহস্বামীর ফোটোগ্রাফ চোখে পড়ল তার। গায়ে তার ফৌজী উর্দি, দেখতে অনেক কমবয়সী আর রোগাটে। হয়ত লোকটা নয়, তার ছোটো ভাই নাকি? থুতনিতে টোল। উঁহুঁ, ও-ই। নিশ্চয় যখন ফোটোটা তুলেছিল তখনো কোনো শেলের টুকরো তার বুকে ঠাঁই নেয় নি।

তারপর তার হাতে ঠেকল একটা রক্তিম বাক্স। নিজেরই লজ্জা হচ্ছিল তার, তাহলেও পারলে না, খুলে ফেললে। বাক্সে ছিল অর্ডার। আসল 'লাল ঝাণ্ডা অর্ডার'। ছেলেটা সেটা হাতে নিয়ে দেখলে। ঠাণ্ডা, ভারি।

কফের বোতাম, পেনসিল-কাটা ছুরি, 'নেভা' মার্কা মারা দাড়ি কামাবার ব্লেড, সবই হাতে নিয়ে দেখল ছেলেটা। এই পরিমাণ পুরুষালী জিনিস সে কখনো দেখে নি। সত্যি, দেখবে কোত্থেকে, সেই তো নিজেদের বাড়ির একমাত্র পুরুষ। জিনিসগুলো তাকে টানছিল। ওগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রায় একটা দৈহিক পুলকই হচ্ছিল তার।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল প্রেসক্রিপ্‌শনটা। খুবই পুরনো। নিশ্চয় লোকটা তা আর ব্যবহার করে নি অনেকদিন। হলদে-হয়ে-আসা ছোট্ট কাগজটায় ছিল বেগুনী

রঙের সীলমোহর: ‘স্যানিটারি ইউনিট, ফিল্ড ডাকঘর ৩১৪৯৭’; লেখাগুলো পার্টকিলে কালিতে। মনে হয়, একসময় যেন জ্বল-জ্বল করত হরফগুলো, তারপর কালক্রমে তাতে মরচে ধরেছে। শুধু প্রথম লাইনটা পড়তে পারল ছেলেটা ‘সার্জেন্ট-মেজর ল. বাখ্‌তিউকভের জন্যে’, তার পরের লেখাগুলো সবই দুর্বোধ্য লাতিনে।

সাবধানে প্রেসক্রিপ্‌শনটা হাতে নিয়ে ছেলেটা আস্তে দেরাজ বন্ধ করলে। ৬ষ্ঠ ‘ক’-এর ছাত্র সের্গেই বাখ্‌তিউকভের খাতায় নজর পড়ল তার। কেন জানি না ঘুষি পাকিয়ে সে খাতাগুলোকে শাসালে।

বুকে টুকরো নিয়ে পাশের ঘরে যে-লোকটা শুয়ে আছে হঠাৎ তার জন্যে কেমন একটা টান অনুভব করল সে। বিশাল চেহারার নির্ভীক সেই পুরুষের জন্যে, যার আছে লাল বাক্সের মধ্যে ফৌজী অর্ডার, পোড়া-পোড়া গন্ধ ছাড়া পলটনী পাইপ আর ‘নেভা’ ব্লেড।

কেন এই দশাসই, শক্তিমান লোকটা অসহায়ের মতো পড়ে আছে সোফায় আর সে, ডানপিটে, কিন্তু আসলে মোটেই অমন বলবান নয় — সে কিনা ছোটাছুটি করে বেড়াতে পারে রাস্তায়, হাসতে পারে, টুপি খসিয়ে দিতে পারে সামনের স্কেটিং-করা ছেলেটির?

৫

ভেজা, গলন্ত তুষারে ব্যাঙের ছাতার গন্ধ। সুড়-সুড় করে তা পায়ের তলে। এখন আর ঘরের ছাদ, রাস্তা, পথচারীদের ওভারকোটের কলার শাদা করে তোলার কাজ তার নেই। মাসের পর মাস এখন তা কুল-কুল করে যাবে নদীতে, গান গাইবে জলের পাইপে, বন্ধুত্ব পাতাবে জাহাজের সঙ্গে। কেবল ডিসেম্বর মাসেই তা আবার ফিরবে শাদা, ধবধবে, নিষ্কলঙ্ক। এখনকার এই যে ধূসর, পদদলিত, গলন্ত বরফ তার ঐন্দ্রজালিক ভোলবদলের আগটায় লোকের পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সে বরফের কতই না তফাৎ!

ব্যাঙের ছাতার গন্ধ পাচ্ছে না ছেলে। ছুটছে সে। হোঁচট খাচ্ছে, ডিঙিয়ে যাচ্ছে বরফ-গলা জলগুলো, ফুটপাথ থেকে নামছে রাস্তায়। টেংরি পর্যন্ত নামা তার স্কি করার ট্রাউজারে লেগেছে কাদা জলের ছিটে। মাফলার একেবারে খুলে এসেছে, উলটিয়ে আসছে খাটো ওভারকোটটার ধার: একটা বোতাম তো নেই।

মনে হবে যেন ট্রাউজার আর ওভারকোট আর টুপিটাই শুধু ওর পক্ষে খাটো তাই নয়। ফুটপাথ, রাস্তা, চকও তার মাপে ছোটো। গোটা শহরটাই আঁটো লাগছে তার গায়ে। হঠাৎ যে উদ্বেগ তাকে পেয়ে বসেছে তাতে নিজের শহরেই সে আঁটছে না।

ছুটতে গিয়ে তার ধাক্কা লাগছে লোকের সঙ্গে, হুমড়ি খাচ্ছে ল্যাম্প-পোস্টে। বড়ো ঘিঞ্জি! সামনে এসে পড়ছে মোটরগাড়ি। ওগুলোর জন্যে এ শহরে কি আর অন্য রাস্তা ছিল না!..

জমে গেল বাঁ কানটা: টুপিটা পরা ডান কানে। লটপট-করা জুতোর ফিতেয় জমে বসেছে বরফ। কিন্তু হিম-হয়ে-যাওয়া হাতে তার আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো এক শিশি ওষুধ।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢোকে সে, আস্তে দরজা বন্ধ করে। চোখ বুজে শুয়ে আছে লোকটা।

ছেলেটা ভাবে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে যখন, তখন সেরে গেছে। ভালোই হল।'

ওষুধের শিশিটা সে রাখে টেবিলের ওপর, হিমে ঝড়ে রুক্ষ হাতটা দিয়ে আনাড়ীর মতো মাফলার জড়ায় গলায়। এবার ওর ছুটি। যাওয়া যেতে পারে।

ঘুমন্ত লোকটাকে সে দেখে প্রায় ভালোবাসা নিয়েই। দুর্বোধ্য এই হৃদয়াবেগটার জন্যে নিজের কাছেই কেমন বিব্রত লাগে তার। নিজেকেই চিনতে পারে না সে... এমন এক এক জন লোক থাকে, যে-কোনো ছেলের কাছেই যে হয়ে ওঠে তার আপন বাবার মতো। এমনকি নিজেকে যারা বেশ বড়ো, স্বাধীন বলে মনে করে, তাদের ওপরেও এসব লোকের পিতৃত্ব ছড়িয়ে যায় অলক্ষ্যে।

এমনি একজন লোককে পেয়েছে ছেলেটা, আর এবার তাকে বিদায় নিতে হবে।

লোকটা কিন্তু চোখ মেলে না। বোঝা যায়, নিজের ওই টুকরোটা সে সামলে উঠেছে, অঘোরে ঘুমচ্ছে এবার। তাই নীরবে বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া ছেলেটার গতি নেই। পা টিপে টিপে হাঁটে সে, মেঝেয় যাতে শব্দ না হয়, দরজা পর্যন্ত গিয়ে হুড়কোর দিকে হাত বাড়ালে। হুড়কো কিন্তু তার বশ মানতে চাইল না, সে শুধু তার আপন লোকদেরই চেনে।

কেঁপে ওঠে ছেলেটা। কানে আসে তার একটা মৃদু দূর শব্দ 'খোকা রে'। লোকটা ডাকছে নাকি? কান পেতে শোনে ছেলেটা। নিস্তব্ধ ফ্ল্যাট। শুধু বরফ-গলা জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে শব্দ তুলছে কার্নিসে। কেউ ওকে ডাকে নি। ওটা ওর মনের ভুল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ভাবে এইবার সে চলে যাবে, আর কখনো লোকটার সঙ্গে দেখা হবে না। 'লাল ঝাণ্ডা অর্ডারটার' ঠাণ্ডা জয়-জয়ন্তী ভার সে আর কখনো অনুভব করবে না তার হাতের তালুতে। পুরনো পাইপের রহস্যময় গন্ধ টেনে নেবে না বুক ভরে। ধীরে ধীরে সে আবার ফিরে আসে ঘরখানায়। সবকিছু এখানে নিশ্চল, যেন ঘুমের রাজ্য। দরজা, বাতি, মেঝে, সবই ঘুমচ্ছে। সেই সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে গৃহস্বামীও। হাত মেলে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে এগিয়ে যায় ছেলেটা: ভয় হয়, ঘুম ভেঙে ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠবে মেঝে।

সোফার কাছে আসে সে। আগের মতোই লোকটা চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, ঘুমচ্ছে।

আর যদি মরে গিয়ে থাকে?!

ভাবতেই আড়ষ্ট হয়ে যায় ছেলেটা। সাবধানতা ভুলে গিয়ে সে ঝুঁকে পড়ে লোকটার ওপর। কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে নাড়া দিতে থাকে। জখম যোদ্ধার চোখ খুলল না। ডাকবে নাকি? পুরনো ফৌজী প্রেসক্রিপশনটায় যা লেখা আছে, সেই উপাধি ধরে? ডাকে ছেলেটা:

'বাখ্‌তিউকভ... বাখ্‌তিউকভ কাকু!'

কেঁপে উঠে চোখ মেলে লোকটা। বেঁচে আছে তাহলে। কিন্তু চুপ করে আছে কেন? ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করছে না যে? চোখ অমন অস্বাভাবিকভাবে ঘুরছে, মাথা এলিয়ে পড়ছে কাঁধে?

বেঁচে আছে, কিন্তু মরেও যেতে পারে।

কী করা যায় এখন? কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। চোখ ওর বিস্ফারিত। চুপ করে বসে থাকা যে চলে না! নিজে না পারলে কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকো!

দরজার দিকে ছুটে যায় ছেলেটা। মেঝের সবকটা কাঠকে সে জাগিয়ে তোলে, যে যার সুরে তান ধরে তারা। কিন্তু কিছুই তার কানে যায় না। ছুটছে সে। জানে না কোথায়।

দু'দুটো করে ধাপ ডিঙিয়ে সে নামে। খটখটিয়ে ওঠে জুতোর হিলে ঠোকা লোহার নাল। জলদি! জলদি! ফুলকি ছোটে নাল দিয়ে। ছেলেটা জানে কী তাকে করতে হবে: অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার।

৬

নীল ফলক আঁটা 'পাবলিক টেলিফোনে' যখন সে পেঁছিল, দুটি মেয়ে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। একটি মেয়ে — বেঁটে, চাঁদ-প্যানা গোল মুখ — হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিল রিসিভারে। অন্য মেয়েটি লম্বা, ঢিপ-ঢিপ চোখ, সখীর কানে অনবরত কী ফিস-ফিস করছিল আর হাসছিল।

'কী বলছে রে? কী বলছে?' এতই জোরে সে ফিস-ফিস করছিল যে তা যাতে অন্যপ্রান্তে শোনা না যায় তার জন্যে হাত দিয়ে রিসিভার চাপা দিতে হল সইকে।

'সিনেমায় যেতে ডাকছে,' চাঁদবদনী বললে তার কৌতূহলী সইকে।

সখী ফের হি-হি করে উঠল এবং ফিস-ফিস করলে আরো জোরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে চেঁচানোর সামিল:

'আর তুই বল যাব না! বলে দে যাব না!'

প্রত্যেকটা কথাই সে বলছিল দু'বার, যেন ভয় পাচ্ছিল দু'বার না বললে চাঁদবদনীর কানে যাবে না।

কয়েক সেকেণ্ড ছেলেটা চুপ করে ওদের লক্ষ করলে। তখনো দম পাচ্ছিল না সে।

অবশেষে সুস্থির হল। রেগে বললে:

'শেষ করো তো! আমায় অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে।'

খাটো ওভারকোট পরা ছেলেটার দিকে দু'সখী চাইলে আক্রোশের দৃষ্টিতে আর যেটি হাসছিল আর ফিস-ফিস করছিল সেটি বিদ্রূপ করে বললে:

'জানি তোর 'অ্যাম্বুলেন্স'। স্কেটিঙে যেতে চাস তাই বল্!'

এতক্ষণে ছেলেটার খেয়াল হল যে তার বগলে স্কেট্স্ জোড়া: প্রতি মুহূর্তে তা আজ তার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মেয়েদুটির একেবারে সামনাসামনি হয়ে সে জোরে ধমক দিলে:

'থামাও বলছি, এক্ষুনি!'

'সেটি হচ্ছে না!' হাত দিয়ে রিসিভার চেপে খেঁকিয়ে উঠল চাঁদবদনী, তারপর মুহূর্তের জন্যে হাত ফাঁক করে বললে, 'কে একটা অসভ্য এসে আমাদের জ্বালাচ্ছে।'

সবুজ চোখ হয়ে উঠল হিংস্র, কণ্টকিত। ওদিকে একটা লোক মরছে, আর এরা এদিকে হি-হি চালাচ্ছে, ন্যাকামি করছে। টিপ-চোখাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছেলেটা রিসিভার কেড়ে নিলে তার সখীর কাছ থেকে। আচমকা এই কাণ্ডটায় মেয়েদুটো চিল্লিয়ে উঠে ছুটে পালাল।

'নচ্ছার কোথাকার!' চেঁচালে একজন।

'অসভ্য!' সায় দিলে দ্বিতীয়া।

কানে রিসিভার ঠেকালে ছেলেটা। অচেনা একটা ছেলের গলা শোনা গেল:

'তাহলে তোমরা সিনেমায় আসছ তো? চুপ করে আছ যে?'

ছেলেটার মনে হল, কথাটা যেন ভেসে আসছে অন্য এক জগত থেকে — নিরুদ্বেগ, কল্যাণময় এক জগত।

হাতলে চাপ দিলে সে, সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে গেল সিনেমায় নিমন্ত্রণকর্তা। ০৩ নম্বরে ডায়াল করল ছেলেটা।

রিসিভারে শোনা গেল এক তরুণীর গলা:

'অ্যাম্বুলেন্স। বলুন —'

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটা ভেবে পেল না কী বলে শুরু করবে। কণ্ঠস্বর অধীর হয়ে আবার বললে:

'অ্যাম্বুলেন্স! কী হল?'

'মানে, একটা লোকের অবস্থা খুব খারাপ,' বললে ছেলেটা।

'নাম?' জিজ্ঞেস করলে নির্বিকার কণ্ঠস্বর।

'কার নাম?'

'রুগীর।'

'রুগী নন, উনি জখম হয়েছেন।'

'কোথায় জখম হলেন?'

'ফ্রণ্টে, ওরেলের কাছে।'

অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা নিশ্চয় এত সব বিদ্ঘুটে কথা শুনতে অভ্যস্ত যে 'ওরেল' এখানে এল কোত্থেকে সেটা জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করল না।

অধীর কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করলে:

'লোকটা রয়েছে কোথায়?'

'বাড়িতে।'

'ঠিকানা?'

থতমত খেলে ছেলেটা। ঠিকানাটা তো তার জানা নেই। সেই কথাই সে বললে:

'ঠিকানা জানি না।'

'তাহলে অ্যাম্বুলেন্স ডাকছিস যে? যাবে কোথায়, গাঁয়ে তোর ঠাকুর্দার কাছে? ঠিকানা জেনে ফোন করিস।'

কানেকশন বন্ধ হবার শব্দ হতে লাগল রিসিভারে। 'অ্যাম্বুলেন্স' রিসিভার নামিয়ে রাখল। ছেলেটাও রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ে দেখলে। মেয়েদুটি নেই। নিশ্চয় এই অসভ্য ঢ্যাঙা ছেলেটা সত্যি কথাই বলেছিল দেখে তারা চুপি-চুপি কেটে পড়েছে। অন্য কোনো পাবলিক টেলিফোনে গেছে নাকি?..

বেরিয়ে এল ছেলেটা। নিজের অসহায়তায়, ছুটে আসার সময় বাড়ির নম্বরটা খেয়াল করে নি বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। তাছাড়া গলির নামটাও সে সঠিক জানে না: গঞ্চারুনি অথবা দেগ্‌তিয়ারুনি এই রকম কিছু একটা

হবে... এখন একটাই উপায় — ছুটে গিয়ে ঠিকানাটা জেনে আসা। ছুটতেই যাচ্ছিল ছেলেটা, এমন সময় দূর থেকে কানে এল অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির হর্ন্।

৭

হ্যাঁ, অ্যাম্বুলেন্স গাড়িই ছুটে আসছে। যাচ্ছে কোথায়? বিপদে-পড়া কোনো লোকের কাছে? নাকি কাজ সেরে ডিপোয় ফিরছে? নাকি ওর টেলিফোন পেয়ে ঠিকানা না জেনেও ছুটে আসছে জখম যোদ্ধার সাহায্যে?

আওয়াজ বেড়ে উঠছে হর্নের। কখনো আকাশে উঠে যাচ্ছে, কখনো সোজা নেমে আসছে নিচে। যেন যুদ্ধের সময়কার সাইরেন।

কিন্তু লাল-ক্রুশ-আঁকা, প্রায় উড়ে-চলা এই গাড়িটা যদি সামনে দিয়েই চলে যায়?

দাঁড় করাতে হবে ওকে!

মন ঠিক করে নিলে ছেলেটা। রাস্তার মাঝখানে ছুটে গিয়ে সে গাড়ির পথ আটকে দাঁড়াল। গাড়িটা তখন ছেলেটার কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। প্রতি মুহূর্তে সে ব্যবধান কমে আসছে। সাইরেন বাজছে কর্ণভেদী। চড়ায় উঠে আর নামছেই না। আতঙ্ক জাগে তাতে। চোখ বুজে ফেললে ছেলেটা, কিন্তু জায়গা থেকে নড়লে না।

হঠাৎ চুপ করে গেল সাইরেন। ঘচাং করে ব্রেক কষল গাড়িটা। রাস্তাটা ছিল পেছল, ছিটকে গেল গাড়িটা।

স্কেট্স্ বগলে ছেলেটা যখন চোখ মেললে, দেখা গেল রাস্তার আড়াআড়ি ঘুরে গিয়ে একেবারে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেটা। হাট করে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল চকচকে টুপি পরা ফ্যাকাশে ড্রাইভার। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছেলেটার কাছে ছুটে এসে হাত তুলেছিল মারবার জন্যে। তবে সামলে নিলে, মারলে না। শুধু হড়বড় করে ধমক দিলে এলোমেলো:

'নিকুচি করেছে তোর! হতচ্ছাড়া!.. মরার সাধ হয়েছে? গাড়ির সামনে লাফিয়ে আসিস! বীরপুরুষ!'

তবে নিজেরই বিহ্বলতার বর্মে ছেলেটা বেঁচে গেল। গালাগালিগুলো তার গায়েই লাগল না। যখন দম ফুরিয়ে গেল ড্রাইভারের, নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু চুপ করলে, ছেলেটা তখন চোখ না তুলেই বললে:

'একটা লোক মারা যাচ্ছে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গেই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল সে, মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের ডিউটি।

'আমি দেখিয়ে দেব,' বললে ছেলেটা।

ভুরু কোঁচকালে ড্রাইভার। অ্যাম্বুলেন্সের কাজে সবকিছুর জন্যেই তৈরি থাকতে হয়। কিন্তু এমনটা সে ভাবে নি।

পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করলে সে, মুখে নিয়ে একটা ধরালে লাইটার দিয়ে। লাইটারটা দেখা যাচ্ছিল না, মনে হল নিজের মুঠো থেকেই সে আগুন বার করছে।

'চল ডাক্তারের কাছে,' বললে ড্রাইভার, 'সে যা বলবে তাই হবে।'

ছেলেটা আর ড্রাইভারটা যখন গাড়িটার কাছে এল, তখন সেখানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি রাস্তায় আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে এতে অলস কৌতূহলীদের না টেনে পারে না। ভিড় করে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিল:

'কী ব্যাপার?'

'কী হয়েছে, বলুন তো?'

'কেউ চাপা পড়েছে নাকি?'

কিন্তু রাস্তায় কেউ পড়ে ছিল না, গাড়ির কাছে এগিয়ে এল শুধু চকচকে টুপি পরা ড্রাইভার আর স্কেট্‌স্ বগলে ল্যাগবেগে একটা ছেলে।

'আর্সেনি ইভানভিচ,' খোলা দরজাটায় উঁকি দিয়ে বললে ড্রাইভার, 'এই ছেলেটির বাবার অবস্থা খারাপ। আমাদেরও আর কোনো কল্ নেই। যাব নাকি?'

'কী হয়েছে ওঁর?' জলদ গলায় কেবিন থেকে জিজ্ঞেস করলে ডাক্তার।

ছেলেটার ইচ্ছে হয়েছিল যে বলে, ড্রাইভারের ভুল হয়েছে, জখম যোদ্ধা মোটেই তার বাবা নয়, অচেনা লোক। তবে তখন ওসব বোঝাবার সময় নেই। তাই পরিষ্কার করে জোর দিয়ে সে বললে:

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জখম লোক। শেলের টুকরো নড়ে উঠেছে বুকে।'

'যাওয়া যাক!' রায় দিলে ডাক্তার।

কেবিনে উঠে বসল ড্রাইভার আর ছেলেটা। সাইরেন বেজে উঠে ভাগিয়ে দিলে অলস কৌতূহলীদের। আর লাফ দেওয়ার আগে ঘোড়ার মতো পেছনের চাকায় একবার ভর দিয়ে সামনে ছুটল অ্যাম্বুলেন্স।

৮

জানত না ছেলেটা, জখম যোদ্ধাকে সে বাঁচা দেখতে পাবে কিনা। তাই দরজা খোলার সময় ও টের পেলে হাত তার ঢিল হয়ে আসছে, অল্প অল্প কাঁপছে হাঁটু। এতক্ষণ পর্যন্ত তার তাড়া ছিল, আর হঠাৎ এখন পা তার আর চলতে চাইছে না। বাখ্‌তিউকভ যদি না বেঁচে থাকে?..

কিন্তু দেরি করা চলে না। পেছনে রয়েছে ব্যাগ-হাতে ডাক্তার আর খালি স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন লোক। নিচে দেউড়ির কাছে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। ভেতরে ঢুকল ছেলেটা। তার পেছু-পেছু তিনজন পুরুষ। শক্ত-সমর্থ লোক তারা, ওভারকোটের ওপর শাদা স্মক। সঙ্গে সঙ্গেই ফ্ল্যাটটা যেন সংকীর্ণ হয়ে উঠল।

সোফায় লোকটা আগের মতোই ফ্যাকাশে, চোখ বন্ধ। বেঁচে আছে, নাকি নেই?

উদ্বেগে ছেলেটার হাত মুঠো বাঁধে পকেটের ভেতর। বাখ্‌তিউকভের হাত টেনে নেয় ডাক্তার। নাড়ি গোনে সে, ঘড়ি দেখে। গুনছে যখন, তখন নাড়ি আছে। বেঁচে আছে তাহলে বাখ্‌তিউকভ। যদিও মোটেই জীবন্তের মতো দেখাচ্ছে না। রোগীর আস্তিন ডাক্তার কাঁধ পর্যন্ত গুটিয়ে তুলে অ্যাম্পিউল তুলে নেয়। দেখতে সেটা ছোট্ট এক টুকরো পড়ন্ত জল-জমা বরফের মতো। নিপুণ টোকা দিয়ে ডাক্তার তার কাঁচের ডগাটা ভেঙে ফেলে। তারপর সিরিঞ্জের ইস্পাৎ-হুল ঢোকায় সেখানে। অজ্ঞান লোকটার হাত নিয়ে ডাক্তার ঠাহর করে কোথায় সুঁই ফোটাবে। জুতোর ডগায় বড়ো বড়ো আঙুলগুলোর ওপর ভর দেয় ছেলেটা।

মনে পড়ে তার, ইশকুলে তাকে টিকে দিয়েছে। সিরিঞ্জ দিয়ে সুঁই ফুটিয়েছে। ব্যথা করে বটে, তবে অসহ্য নয়। আসলে, তেমন কিছু না। কিন্তু ছেলেটার মনে হয়

বাখ্‌তিউকভের বোধ হয় শত গুণ ব্যথা করবে। ইনজেকশন ছাড়াই তো তার কষ্ট হচ্ছে! পাঁজরে কনুই চেপে ছেলেটা চোখ কোঁচকায়। সুঁই ঢুকে গেল হাতে।

স্ট্রেচারটা কোণে রেখে অন্য দুটো লোক বসল চেয়ারে। প্রকাণ্ড, দশাসই লোক তারা। চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। ডাক্তার কী করছে সেদিকে ওদের নজর নেই। নিজের মনেই তারা আছে। সবই ওদের জানা। আর্ত ও পীড়িতদের ক্রমাগত দেখে দেখে বুক ওদের চট-পড়া। ওরা আছে ওদের নিজেদের ভাবনা নিয়ে।

'সিঁড়িটা সরু,' বলে একজন, 'স্ট্রেচার গলবে বলে মনে হয় না।'

'যাবে, যাবে,' বলে অন্য জন, 'খানিকটা উঁচু করে তুললেই হবে।'

'কিন্তু রোগী তো ভারি।'

পেছনে ওদের শান্ত কথাবার্তা কানে আসে ছেলেটার, ইচ্ছে হয় দু'কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু মুখ ফেরায় না সে। তাকিয়ে থাকে বাখ্‌তিউকভের দিকে। চোখ মেলে বাখ্‌তিউকভ।

ছেলেটাকে দেখে সে। তার জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা, সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। কোথাও যায় নি নাকি ছেলেটা? অতন্দ্র প্রহরীর মতো ঠায় ওইভাবেই সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রে? বাখতি-উকভের ইচ্ছে হয় এই ঢ্যাঙা বেঢপ ছেলেটার দিকে চেয়ে হাসে। কিন্তু হাসির বদলে দেখা দেয় একটা পীড়িত মুখবিকৃতি: ভয়ানক যন্ত্রণা করে ওঠে। ডাক্তার আর স্ট্রেচার বইবার লোকদের দেখতে পায় সে। এবার সবই বোঝে।

'কী করবেন?' জিজ্ঞেস করে ডাক্তারকে।

সিরিঞ্জ গুটিয়ে নিয়ে ডাক্তার জবাব দেয়:

'হাসপাতালে যাবেন।'

চুপ করে থাকে বাখ্‌তিউকভ, তারপর বাধ্যের মতো মাথা নাড়ে। দৃষ্টিতে ওর দুর্ভাবনা ফুটে ওঠে। সঙ্কুচিতের মতো হেসে সে ছেলেটাকে বলে:

'খোকা রে, একটু কাজ করে দিবি, সাপোজকে আমার বৌ ছেলেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দে।'

'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেব,' চট করেই রাজী হয়ে যায় ছেলেটা।

আর কেন জানি অভিমান হয় তার: লোকটা এখনো ভাবছে তার সের্গেই বাখ্‌তিউকভের কথা। আর সের্গেই ওদিকে নিশ্চয় ছেলেপিলেদের সঙ্গে স্কী করে বেড়াচ্ছে...

'একটু কাগজ পেনসিল এনে দে-না।'

পাশের ঘরে যায় ছেলেটা। ক্যালেন্ডারের পাতাটা এখনো বাখ্‌তিউকভকে ডাকছে চারটের সময় পার্টি কমিটিতে যেতে... টেবিলে রয়েছে ৬ষ্ঠ 'ক'-এর সের্গেই বাখ্‌তিউকভের দুটি খাতা। প্রথম খাতাটা নিয়ে হেলাফেলায় সেটা খোলে সে। রচনার খাতা। ঝরঝরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা শিরোনামা: 'আমার গ্রীষ্মযাপন'। কোথাও কালির ছোপ পড়ে নি, কাটাকুটি নেই। 'শুচিবাই তো খুব!' তাচ্ছিল্য করে ভাবে ছেলেটা, প্রথম ছত্রগুলো পড়ে: 'গ্রীষ্ম আমি কাটাই সাপোজক শহরে দিদিমার কাছে। শহরটা ছোটো। অনেক গাছপালা আছে...'

খাতাটা থেকে পাতা ছেঁড়ে ছেলেটা। ছেঁড়ে সমান করে নয়, এবড়োখেবড়ো করে — ছেলেটা বুঝুক যে পাতাটা ছিঁড়ে নেওয়া।

লিখতে কষ্ট হচ্ছিল বাখ্‌তিউকভের। আঁকাবাঁকা হয়ে যায় অক্ষরগুলো, যেন তারাও অসুস্থ, দাঁড়াতে পারছে না। সাপোজকের জন্যে টেলিগ্রামটা লেখে সে, আর নিজের নোটবুকে ডায়েরি লেখে ডাক্তার। লেখা শেষ হতেই অন্য লোকদুটো যেন হুকুম পেয়েই উঠে দাঁড়ায়। স্ট্রেচারটা তারা ঠিকঠাক করতে থাকে।

বাখ্‌তিউকভের দিকে চেয়ে থাকে ছেলেটা। হঠাৎ তার মনে হয় এ টেলিগ্রামটা সের্গেইকে না লিখে বাখ্‌তিউকভ যদি তাকে লিখত, তাহলে কী সুখীই না সে হত। মন ভার করে তাকিয়ে থাকে সে। বোঝে, এইবার তাদের ছাড়াছাড়ি হবে চিরকালের মতো। অনেকখন ধরে লেখে বাখ্‌তিউকভ। ছেলেটার ইচ্ছে হয় যেন আরো সে লিখে যায়। কখনোই যেন শেষ না হয় তার টেলিগ্রাম লেখা।

'এই নে,' বলে বাখ্‌তিউকভ কাগজটা আর টাকা এগিয়ে দেয় ছেলেটাকে, 'কাজটা করে দিস রে খোকা। অনেক তোকে ধন্যবাদ।'

স্ট্রেচারে শোয়ানো হয় রোগীকে। সরে দাঁড়ায় ছেলেটা। ওর ক্ষমতা থাকলে ও

নিজেই শুইয়ে দিত। শোয়াত অনেক ভালোভাবে। আর এ লোকগুলো বাখ্‌তিউকভকে এমন ঝাঁকাচ্ছে...

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার মনে হয় এ সবকিছুই সত্যি নয়। এ সবই সিনেমা, সে শুধু দেখছে। সে আছে পর্দার ওপাশটায়। বগলে তার 'বৃটিশ স্পোর্টস' স্কেট্‌স্‌, আর এখানে, এই ঘরের মধ্যে, স্ট্রেচার, শাদা স্মক, ওষুধের গন্ধ, আর প্রকাণ্ড, ভালো, আপনার জন, বিপন্ন একটি মানুষ।

স্ট্রেচারের ডাণ্ডা ধরে লোকদুটো।

'ধরেছিস?' বলে সামনের লোকটা।

'ধরেছি, ওঠা!'বলে পেছনকারটা।

মেঝে থেকে উঠে যায় স্ট্রেচার।

ঘর দিয়ে, অন্ধকার করিডর দিয়ে ভেসে চলছে স্ট্রেচার। পেরিয়ে যায় হলুদ রোদ-রঙে ঢালা কামরাটা। তালার ফুটোতে এসে পড়েছে এক ঝলক রোদ। ঋজু, জ্বলজ্বলে। ছোটো ছোটো জীবন্ত পোকার মতো তাতে ঘুরপাক খাচ্ছে ধূলিকণা। স্ট্রেচারটা যাওয়ার সময় রোদটা পড়ল জখম যোদ্ধার গালে। বিদায় জানাল তা গৃহস্বামীকে।

রাস্তায় বাখ্‌তিউকভকে বললে ছেলেটা:

'আসি।'

'তুই এখনো এখানে?' বললে জখম যোদ্ধা, তার গভীর বড়ো-বড়ো চোখের সঙ্গে চাওয়া-চাওয়ি হয় ছেলেটার সবুজ বিষণ্ণ চোখজোড়ার।

গোঙিয়ে উঠল সাইরেন। গাড়িটা পিছলে কেঁপে উঠে রওনা দিলে।

আর হাতে টেলিগ্রামের খসড়া নিয়ে ছেলেটা চেয়ে রইল সেদিকে।

৯

কী লাভ এই স্কেট্‌স্‌ জোড়ায়, খামোকা কেবল বগল জুড়ে থাকছে! পায়ে পরা থাকলে বেশ ছোটা যেত, সময় বাঁচত, কমত দূরত্ব। কিন্তু শহরে স্কেটিং করার বিশেষ সুবিধা নেই। বরফ সব ভাঙাচোরা নয়ত বালি ছিটানো। অথচ হল্যান্ডে সবাই

শীতকালে হাঁটে স্কেট্‌স্‌ পরে। বুড়ীরাও সেখানে স্কেটিং করে যায়। তবে সে তো আর সাধারণ রাস্তা নয়, ক্যানেল, নীলাভ মসৃণ বরফে ঢাকা।

স্কেট্‌স্‌ কাজ দেয় যখন তা থাকে পায়ে, কিন্তু বগলে বইতে হলে তা কেবলি অসুবিধা ঘটায়।

ফের তাড়া লেগেছে ছেলেটার। চটপট পাঠাতে হবে টেলিগ্রামটা। কেননা টেলিগ্রামে বাখ্‌তিউকভ নিশ্চয় আসতে বলেছে তার বৌ আর ছেলেকে, ওই দু'চোখের বিষ সের্গেইটাকে, যে রচনা লেখে একেবারে বেদানার দানার মতো অক্ষরে, একটিও কাটাকুটি করে না। চুলোয় যাক গে! বাখ্‌তিউকভের যখন ইচ্ছে, তখন আসুক সের্গেই।

একটা কান সব সময়েই গরম, টুপির তলে আছে সেটা, অন্য কানটা একেবারে জমে গেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ির সময় টুপিটা সরিয়ে বসাবার সময় কোথায়।

তবে ডাকঘরটা গরম। লালচে গালা, চ্যাটচেটে আটা আর আরো কী সব দুর্লভ ডাকঘরের গন্ধে তা আমোদিত। ভেতর দিকে টরে-টক্কা হচ্ছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রে। নাকি 'বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ!' করে কড়া হুকুমদারি ফলকটা টাঙানো যে-দরজায়, তার ভেতরে কেমন করে যেন কোনো গলন্ত বরফ পেঁছে গেছে, তারই জল পড়ছে টপ-টপ।

ডাকঘরে ঢুকতেই গরম লাগতে শুরু করল ছেলেটার। ওভারকোটের বোতাম খুলে ফেললে সে, আলগা করে দিলে সবুজ মাফলার। হাট করে খোলা ওভারকোটটায় তাকে দেখাল ডানা-মোড়া দাঁড়কাকের বাচ্চার মতো। টেলিগ্রামের কাউণ্টারে এসে সে কাগজটা এগিয়ে দিলে।

'এ সব কী কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং?' চটে উঠল কাউণ্টারের মেয়েটি, 'একটু ভালো করে লেখারও মুরদ হয় নি? ছোটো তো আর ন'স! নে, এই ফর্মে লিখে দে!'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ছেলেটা, তবে কৈফিয়ৎ দিতে গেল না যে টেলিগ্রামটা লিখেছে সে নয়, জখম একজন লোক, হাতে পেনসিল ধরারও যার শক্তি ছিল না।

ডাকঘরের মাঝখানে ছিল কাঠের এক ব্যাঙের ছাতার মতো টেবিল। স্কেট্‌স্‌ জোড়া তার গোড়ায় রেখে টেলিগ্রাফ ফর্মটা সে পাতলে সেই ছাতার ওপর।

তাড়াহুড়া না করে নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যেই হরফ এ'টে সে ঠিকানাটা লেখার চেষ্টা করলে। পরিপাটী করেই লিখতে চাইছিল ছেলেটা, কিন্তু লেখার ছাঁদটা হল এলোমেলো, হরফগুলো হয়ে গেল লম্বাটে, ফর্মের ঘরগুলোর মধ্যে আঁটল না।

ঠিকানাটা লেখার পর জোরে নিশ্বাস ফেললে সে — কাজটা তো আর সহজ নয় — তারপর লিখতে লাগল মূল বয়ান:

'অসুস্থ। হাসপাতালে। বাড়ি তালাবন্ধ। আসার দরকার নেই। বাবা।'

কেবল এতক্ষণে, টেলিগ্রামটা লেখা হয়ে যাবার পরই তার মাথায় ঢুকল তার মানে। না তো, বাখ্‌তিউকভ তো ওদের ডেকে পাঠায় নি। শুধু নিজের রোগের খবরটা দিয়েছে। ক্রুদ্ধ সবুজ ঝিলিক জ্বলে উঠল ছেলেটার চোখে। তার মানে ও ডাকঘরে ছুটে এল শুধু সের্গেই বাখ্‌তিউকভকে এই কথাটা জানাতে যে সে আরামে ছুটিতে থাক, যখন বাপ তার হাসপাতালে, জীবন তার বিপন্ন?! টেলিগ্রামটা ছি'ড়ে ফেলার ইচ্ছে হয়েছিল ছেলেটার। লিখবে নতুন একটা টেলিগ্রাম, নিজের মনের মতো। তাতে প্রাণভরে গাল দেবে সের্গেইকে। ওর সম্পর্কে সে যা-কিছু ভাবে সব মুখের ওপর বলে দেবে... কিন্তু সেটা সে করলে না।

টেলিগ্রাম লেখা যখন শেষ হল, কাউণ্টারে তখন লাইন লেগেছে। নীরবে ছেলেটা কিউ'য়ে গিয়ে দাঁড়াল।

ঝুলে পড়েছে ছেলেটার কাঁধ। সবুজ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত, হতভম্ব। এক হাতে স্কেট্‌স্‌ জোড়া, অন্য হাতটা খালি। অকারণে দুলছে সে হাতটা, আর হাতের মালিক হোঁচট খেতে গেলে তাকে সামলাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমতে লাগল হাতটা, ছেলেটা তা পকেটে ঢোকালে।

আঙুলে ঠেকল কী একটা কাগজ। আরে, তাই তো, এ তো সেই খাতার ছে'ড়া পাতাটা, ডাকঘরের মেয়েটা যা নেয় নি। কাগজটা বার করে ছেলেটা টলে-টলে-পড়া অক্ষরে তৈরি শব্দগুলো ফের পড়তে লাগল: 'অসুস্থ। হাসপাতালে। বাড়ি তালাবন্ধ। আসার দরকার নেই। বাবা।'

বাবা... এই কথাটা ছেলেটা পড়লে মনে মনে নয়, চে'চিয়ে। জীবনে কখনো সে

কথাটা উচ্চারণ করে নি, ইচ্ছে হল দেখে কেমন সেটা শোনায়। আর নিজের গলাকেই চিনতে পারল না সে। মনে হয়, অন্য কেউ বুঝি ওটা বললে।

সের্গেই বাখ্‌তিউকভ কী ভাবে 'বাবা' বলে সেটা কল্পনা করতে চাইল ছেলেটা। মনে হল তার যেন সত্যিই সের্গেইয়ের গলা সে শুনতে পাচ্ছে। মুখ কোঁচকালে ছেলেটা, ভুল সুর কানে এল যেভাবে কোঁচকায় সুরকার।

আর হঠাৎ তার মনে হয় সের্গেই বা তার মা কেউ লোকটার কাছে আসবে না। ছুটি ফুরাবার আগে তারা সাপোজক শহর ছাড়বে না, ছুটে আসবে না সেই লোকটার কাছে, হাসপাতালে যে মরণাপন্ন। সেই লোকটা যার নাম 'বাবা'।

চোখের সামনে তার ভেসে উঠল, বাখ্‌তিউকভ একলা হাসপাতালের খাটে। টের পেলে, জমে-ওঠা চোখের জলে চিন-চিন করছে চোখের কোণ।

আচ্ছা, হাসপাতালে গেলে কেমন হয়? শুধু এমনি, গিয়ে জেনে নেবে কেমন আছে রোগী ল. বাখ্‌তিউকভ। বলবে, অভিনন্দন জানিয়ে দিতে, তারপর চলে আসবে। অন্তত লোকটার অমন একলা লাগবে না।

না, স্কেটিং রিঙ্কে যাবারও ওর ইচ্ছেই হচ্ছে না। মেজাজ নেই। কালকেও তো সেখানে যাওয়া যায়। কোথাও যাবারই তার তাড়া নেই।

সংকট মুহূর্তে লোকে যখন সাহায্য চায় না, বরং নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে বলে, তখন যেতেই হবে এমন নয়। তাই নয় কি?

১০

ডাকঘরের সিঁড়ি থেকে নেমে আসে ছেলেটা। এখন আর তার কোথাও যাবার তাড়া নেই। স্কেট্‌স্‌ জোড়া এখন তার বগলে নয়, হাতে। স্কেট্‌সের ঝকমকে রানারে হাত ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে, কিন্তু সর্বনাশের কিছু নেই তাতে, শহরটা তপ্ত হয়ে উঠেছে, যদিও সূর্য ঢলে পড়েছে অস্তাচলে, কেঁপে কেঁপে ওঠা শীতার্ত গা মেলে পৃথিবী তার রোদ পোয়াচ্ছে। গরম হচ্ছে।

গলন্ত বরফ এখন অসংখ্য। জানলায়, কার্নিসে, কিওস্কের ছাদে তাদের স্বচ্ছ জলবিন্দু টুপটাপ ঝরে পড়ছে অবিরাম। শব্দ উঠছে যেন একটানা মেসিনগানের

গর্লি। বরফ আর হিমানীকণা, তুষার-ঝড় আর শৈত্যের দিকে তার ক্ষিপ্র মেসিনগান চালাচ্ছে বসন্ত।

চারিপাশে চাইতে ছেলেটার নজরে পড়ল স্কোয়ারে বরফের স্তরটা বসে বসে গেছে, দেখাচ্ছে যেন চাঁদের উপরিভাগ। তার খড়খড়ে ম্যাড়মেড়ে চটার মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে চান্দ্র গহ্বর। আর পাতার কলি ফুটতে, ঘাস গজাতে এখনো কিছ্ন দেরি থাকলেও ফার গাছগন্লোর একেবারে ডগায় ডগায় দেখা দিয়েছে তাজা সবনজ। গত বছরের কালচে কাঁটাগন্লো শক্ত, আর নতুন বাসন্তী কাঁটাগন্লো এখনো কড়া হয় নি, কামড় দিতে শেখে নি। গালে ছোঁয়ালে বোঝা যায় কী নরম।

স্কেট্‌স্‌ বগলে ছেলেটা হাঁটছে শহরের রাস্তায়...

সত্যি, বেশভূষার দিকে ওর একেবারেই দৃষ্টি নেই! এমনকি শাদা-টুপি-পরা মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবার কথা ভেবেও নিজেকে একটু ফিটফাট করে নেবার চাড় হচ্ছে না ওর। আচ্ছা, ও যে আজ স্কেটিং রিঙ্কে যায় নি, সেটা কি মেয়েটা খেয়াল করেছে? নাকি স্কেটিং করা বাকি সকলের মতো ওর প্রতিও মেয়েটি একেবারে উদাসীন?

ছেলেটা সরে গেল অন্যদিকে তারপর নিজের অজান্তেই গতি বাড়িয়ে হাঁটতে লাগল শহরের হাসপাতালের দিকে।

১১

প্রত্যেকটা বাড়িরই এক-একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, এমনকি তা যদি বাসাবাড়ি না হয় তাহলেও। ডাকঘরের আছে ডাকঘর-ডাকঘর গন্ধ, রন্টির দোকানে রন্টি-রন্টি, হাসপাতালে ওষন্ধপত্রের গন্ধ।

ডাকঘরের গন্ধে থাকে পার্শেল আর বনক-পোস্ট, টাটকা খবরের কাগজ আর কালো ডাক-ছাপ দেওয়া বিদেশী টিকিটের কাহিনী। রন্টির দোকানের গন্ধ শোনায় কড়া-সেঁকা পাঁউরন্টির চটা, কালো কালো মশলা দেওয়া আংটা রন্টি, মিষ্টি সিরাপের প্রলেপ দেওয়া বান-রন্টির ডাক।

হাসপাতালের গন্ধে কিন্তু ভালো কিছন্র আমেজ থাকে না। ঢুকতেই সে গন্ধ লোকের নাকে যায়, ব্যথা আর যন্ত্রণার খবর দিয়ে মন খারাপ করে দেয় তার।

'ভর্তির ঘর' নাম লেখা দরজাটা দিয়ে ঢুকতেই এই গন্ধটা পেলে ছেলেটা।

ভর্তির ঘরে একেবারে জমকালো স্তব্ধতা। সত্যি বলতে, এটা খাস ভর্তির ঘর নয়, তার সামনের করিডর মাত্র। চকচকে, পিচ্ছিল টালি বাঁধানো মেঝের ওপর একটা শাদা কাঠের বেঞ্চি ছাড়া আর কিছু নেই এখানে।

ইতস্তত করে ছেলেটা গিয়ে দাঁড়াল একটা কাঁচের দরজার কাছে। দরজাটা আধখোলা। উঁকি দিতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ডিউটি-রত ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারের মাথায় শাদা টুপি, বড়ো-বড়ো কালো দাড়ি। স্মকের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গোটানো। চেহারাটা তার কড়া, ছেলেটার মনে হল, একটু যেন রগচটা। আগন্তুককে ডাক্তার কড়া দৃষ্টিতে যাচাই করে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। ছেলেটার কাছে গিয়ে সে যা বললে তা একেবারে অপ্রত্যাশিত:

'তোর এটা 'বৃটিশ স্পোর্টস' ? কই দে তো দেখি।'

অবাক হয়ে ছেলেটা স্কেট্স্ এগিয়ে দিল ডাক্তারকে। ডাক্তার সেটা নিয়ে নখ দিয়ে তার ধার পরীক্ষা করলে। স্কেট্স্ জোড়া ডাক্তার যতক্ষণ দেখছিল, ছেলেটা ততক্ষণ তাকিয়ে ছিল ডাক্তারের দিকে। লোকটা অল্পবয়সী। মুখে তার একটিও বলিরেখা নেই, আর গালদুটো এমন লাল যেন এইমাত্র স্কেটিং করে ফিরেছে। এ কথাটা ভাবতেই ছেলেটার মনটা হালকা হালকা লাগল। জিজ্ঞেস করলে:

'আপনাদের এখানে একজন রোগী এসেছে। ল. বাখ্‌তিউকভ। কেমন আছে সে?'

স্কেট্স্ জোড়া ফেরত দিয়ে ডাক্তার দাড়ি চুলকাল।

'বাখ্‌তিউকভ?' জিজ্ঞেস করলে সে, 'বুকে শেলের টুকরো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি সায় দিলে ছেলেটা, 'অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে এসেছে।'

'সবাই আমাদের কাছে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতেই আসে।'

চুপ করে রইল ছেলেটা।

'কেসটা কঠিন,' হঠাৎ কোমল হয়ে এল ডাক্তারের গলা, কঠোরতার চিহ্নমাত্র রইল না, 'কী দাঁড়াল এক্ষুনি জেনে নিচ্ছি। তুই ওই বেঞ্চিটায় ততক্ষণ বসে থাক্। অবিশ্যি বাইরের লোকের থাকা এখানে বারণ, তবে কেসটা গুরুতর।'

ডাক্তার তার ভর্তির ঘরে ঢুকে গেল আর ছেলেটা বসল বেঞ্চিতে। বসতেই সারা শরীর জুড়ে এমন একটা দুর্বলতা পেয়ে বসল তাকে যে চোখ বন্ধ করে ফেললে। এমন পর্যন্ত তার মনে হল সে আর কখনোই যেন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

কানে আসছিল তার কাঁচের দরজাটার ওপাশে টেলিফোন করছে দাড়ি-ওয়ালা নবীন ডাক্তারটি, জিজ্ঞেস করলে বাখ্‌তিউকভের কথা, নিজের পরিচয় দিলে ভর্তি ঘরের ডাক্তার কন্‌।

কিছুক্ষণ পরে ফের তাকে দেখা গেল দরজায়। পরীক্ষকের দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে চেয়ে সে বললে:

'শোন। এক্ষুনি বাবার অপারেশন করা হবে। অপেক্ষা করবি?'

'করব।'

তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ডাক্তার অন্তর্ধান করলে দরজার ওপাশে।

১২

কিছু লোকের জন্মই হয় কেবল এক জায়গায় বসে থাকার জন্যে। তাদের মূলমন্ত্র হল: তন্নিষ্ঠেই মোক্ষ। আবার কিছু লোক আছে যারা অস্থির। ডেস্কের সামনে তারা ছটফট করে, ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত তারা বসে থাকতে পারে না ক্লাসে, লাইনে দাঁড়াতে হলে তাদের কষ্টের আর শেষ থাকে না। এই ধরনের লোকই হয় পর্যটক আর নির্মাণকর্মী, গুপ্ত-সন্ধানী বা ডাকপিয়ন। তাদের মন্ত্র চরৈবেতি, গতি, পরিবেশের পালাবদল।

স্কেট্‌স্‌ বগলে ছেলেটা পড়ে এই ধরনের লোকের দলে।

কেন তাহলে শহরের হাসপাতালে ভর্তির ঘরে সে বসে আছে চুপচাপ, ছটফট করছে না? পা দোলাচ্ছে না, তবলা বাজাচ্ছে না হাসপাতালের শাদা বেঞ্চিটায়? কিন্তু তার মানে মোটেই এ নয় যে সে শান্ত। ছটফট করছে তার চিন্তা। কী হচ্ছে অপারেশনে? বাখ্‌তিউকভের লাগছে, নাকি অবেদনিক ইনজেকশন দিয়েছে তাকে?.. নিশ্চয় তাহলেও লাগছে বৈকি।

মনের মধ্যে তার অপারেশন ঘরের ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে যেন নিজেই সে শুয়ে আছে অপারেশন টেবিলে। চেষ্টা করছে যন্ত্রণা সইতে... মনে পড়ে একবার গ্রীষ্মে সে পেরেকে পা দেয়, পায়ে জুতো ছিল না। বেশ গভীরে ঢুকে যায় পেরেকটা। প্রথমটা তেমন লাগে নি। তারপর ক্ষতে আইওডিন লাগানো হয়। যন্ত্রণায় সে এক পায়ে লাফাতে থাকে। এরপর ব্যথাটা দাঁড়ায় ভোঁতা আর একটানা।

প্রায় দৈহিকভাবেই যন্ত্রণাটা যেন সে টের পায়। জুতোর ভেতর পা তার নড়ে ওঠে।

তবে বাখ্‌তিউকভের নিশ্চয় লাগছে আরো বেশি।

হঠাৎ ছেলেটা মনে মনে পৌঁছে যায় এক শহরের কাছে, দৃপ্ত তার নাম — ওরেল (ঈগল)। ওপর থেকে সে তাকিয়ে দেখে স্তেপ। ছুঁচোর গর্তের মতো সব জায়গায় ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের ট্রেঞ্চ: চারপাশে কাঁচা মাটির ঢিপ। স্তেপ বেয়ে আসছে সব ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক, দেখতে হলদে হলদে কাছিমের মতো। ধীরে ধীরে কাছিমগুলো এগিয়ে আসছে ছুঁচোর গর্তগুলোর দিকে।

দেখতে পায় সে ছুঁচোর গর্তগুলোর ওপর আগুনের ঝলক। ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান গোলা দাগছে ট্যাঙ্কে। একটা ট্যাঙ্ক থেমে গেল। গাঢ় কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে। ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়াটা। ঘাসের ওপর দিয়ে গিয়ে তা ঢেকে ফেলছে কাছিম আর ছুঁচোর গর্তগুলো। তলে কী হচ্ছে এখন আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু ধোঁয়ার মধ্যে ঝলসাচ্ছে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের ঝলক, যেন কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ।

ছেলেটার মনে হয় সে যেন মাটি দিয়ে হাঁটছে, ধোঁয়া সরাচ্ছে দুই হাতে। গাঢ় ধোঁয়া, জলের মতো, অসুবিধা হচ্ছে হাঁটতে। কালচে মাটি। পোড়া-পোড়া গন্ধ তাতে, বাখ্‌তিউকভের দেরাজে পুরনো ফৌজী পাইপটার মতো।

এই তো বাখ্‌তিউকভের কামান... বাখ্‌তিউকভ নিজে। রোগা, বর্তমান বাখ্‌তিউকভের ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতে। গায়ে তার বোতাম-খোলা ফৌজী শার্ট... গোলা দাগছে কামান। প্রতি বার গোলা দাগের পর একটু করে যেন গুড়ি মারছে কামানটা, পিছিয়ে আসছে নলটা, যেন লুকতে চাইছে, তারপর কী ভেবে

আবার ফিরে আসছে আগের জায়গায়। আর বাখ্‌তিউকভ চেঁচিয়ে যাচ্ছে: 'ফ়ায়ার! ফায়ার!'

বাখ্‌তিউকভ যত জোরে চেঁচায়, ততই প্রচণ্ড হয়ে ওঠে গোলাবর্ষণ।

'ফায়ার!' চেঁচায় বাখ্‌তিউকভ। ঠোঁট থেকে তার আগুন বেরয়। আগুন গিয়ে লাগে ট্যাঙ্কে। পুড়ে যায় ট্যাঙ্ক।

কিন্তু পরের ট্যাঙ্কটা গোলা মারে। পড়ে যায় বাখ্‌তিউকভ। উল্টে যায় কামান।

...ঘাসের ওপর পড়ে আছে বাখ্‌তিউকভ। মুখ ফ্যাকাশে, মাথায় টুপি নেই। ফেল্ট বুটে রক্ত... না, না, ফেল্ট বুট নয়, চামড়ার হাই বুট... বাখ্‌তিউকভ অনেক বড়ো আর ভারি, কিন্তু ছেলেটা তাকে একাই বয়ে নিয়ে যায়... নিজের দেহ দিয়ে সে তাকে ফ্যাসিস্ট 'ফের্ডিনাণ্ডের' শেলের টুকরো থেকে আড়াল করে রাখে।

জোরে জোরে ঢিপ-ঢিপ করে তার বুক। ভর্তির গোটা ঘরটা জুড়ে তা বাজে। শান্তি নেই ভর্তির ঘরে।



রুগ্ণ, আর্ত লোকেদের আনা হয় এখানে। আপন লোকেদের জন্যে লোকে এখানে দুশ্চিন্তা করে।

অপেক্ষা করে আছে ছেলেটা। বসে আছে একই জায়গায় স্থির হয়ে। কিন্তু ভাবনা ওর অস্থির। স্কেটিং, শহরটা, নিজের বাড়ি — সব এখন তার মুছে গেছে মন থেকে। আছে শুধু জখম যোদ্ধা। হুকুম চালাচ্ছে সে ছেলেটার ভাবনার ওপর, সে ভাবনা একমাত্র তারই বশীভূত।

১৩

দেখা যাচ্ছে, ভাবনাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মন্থর হয়ে আসে তার গতি। বন্ধ করে ছোটাছুটি। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে না। অপেক্ষা করে।

ক্লান্তভাবে ছেলেটা মাথা হেলান দেয় দেয়ালে। তাকিয়ে থাকে স্থির একটি বিন্দুতে। ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের ট্রেঞ্চ বা ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক এখন আর সে কিছু দেখছে না।

'বাথ্তিউকভের জন্যে কে এসেছে?'

চমকে ছেলেটা লাফিয়ে ওঠে বেঞ্চি থেকে।

'আমি!'

সামনে তার একজন বর্ষীয়সী নার্স দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত মোটা সে, মনে হয় যেন অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচার-বাহকদের মতো স্মক পরে আছে ওভারকোটের ওপর।

'তুই?' গাঢ়, প্রায় পুরুষালী গলায় জিজ্ঞেস করে নার্স।

তারপর থেমে থেমে বলে যায় সে, যেন কাগজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছে।

'খুব কঠিন অপারেশন। অনেক রক্ত গেছে রোগীর। তবে সবই ভালোয় ভালোয় উৎরেছে।' তারপর হঠাৎ সে মেয়ের মতোই মমতাভরে তাকায় ছেলেটার দিকে, কথা বলে একেবারেই অন্য সুরে, মেয়েলী গলায়, 'ভাবনা নেই রে, ভাবনা নেই। বাপ তোর বেঁচে থাকবে। ধাত ওর খুব শক্ত।'

'ভালো হতে কদ্দিন লাগবে?'

'সবুজ পাতা ফোটা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হবে,' বলে নার্স, 'এবার বাড়ি যা। মাকে বলিস ভাবনা নেই... আর এটা তুই রেখে দে স্মৃতি হিশেবে।' মরচে ধরা এক টুকরো লোহা এগিয়ে দিল সে।

'কী এটা?' জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেটা চাইল নার্সের দিকে।

'শেলের টুকরো।'

এটা সেই টুকরো, যুদ্ধ শেষ হবার বহু বছর পরে যা হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ওরেলের কাছে যা পারে নি, চেষ্টা করে সেটি করতে, সৈনিকের হার্টকে বিকল করে দিতে।

'একেবারে হার্টের কাছ থেকে বার করতে হয়েছে,' বোঝালে নার্স, তারপর সচকিত হয়ে তাড়া দিলে, 'নে, আমার আর সময় নেই। বাপকে কিছু বলতে হবে?'

একটু ভাবনায় পড়ল ছেলেটা। রুগ্ণ বাপেদের কাছে সাধারণত কী কথা বলে পাঠায় তাদের ছেলেরা?

'বলে দেবেন যে বাড়িতে সব ঠিক আছে। চুমু পাঠাচ্ছে তাকে... সবাই। আর তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুক।'

কথাগুলো ওর কাছে মনে কেমন কাটখোট্টা, কিন্তু অন্য কোনো কথা ওর জানা ছিল না। টুকরোটা মুঠোয় নিয়ে চাপলে সে, বেশ ব্যথা লাগল — কানাগুলো ওর ধারালো।

চলে গেল নার্স।

গেল সেখানে, যেখানে আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে শুয়ে আছে ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট-মেজর বাখ্‌তিউকভ। শুয়ে আছে চোখ মেলে, দাঁত কড়মড় করছে যন্ত্রণায়।

নার্স তার কাছে গিয়ে বালিশ ঠিক করে দিলে, তারপর যেন এমনি, হঠাৎ করে বললে:

'কী ভালো আপনার ছেলেটি!'

'ছেলে?' ব্যথা ভুলে ক্ষীণ হাসলে বাখ্‌তিউকভ।

'গোটা অপারেশনটা ও ভর্তির ঘরে বসে ছিল। ছটফট করছিল।'

'ছেলে,' ফিসফিসিয়ে বললে বাখ্‌তিউকভ, মনে হল যন্ত্রণা যেন কমে এসেছে।

টেলিগ্রাম তাহলে ঠিক সময়েই পেঁছেছে। ছেলে তাহলে ওর রোগের কথা শুনতেই ছুটির কথা ভুলে ছুটে এসেছে শহরে!..

লোকটার খেয়ালই হল না যে এত তাড়াতাড়ি কোনো টেলিগ্রামই ওই দূর সাপোজক শহরে পেঁছতে পারে না, ছেলে এসে পেঁছনো তো দূরের কথা।

১৪

অন্ধকার হয়ে এসেছে শহরটা। বরফের চটার ওপর আর দেখা যাচ্ছে না চান্দ্র গহ্বরগুলো। ফার গাছের কচি, নরম কাঁটাগুলোকে আর কড়া, খোঁচা-খোঁচা পুরনো কাঁটাগুলো থেকে তফাৎ করা যাচ্ছে না। পিচ্ছিল, রুপোলী যে বরফগুলো থেকে জল ঝরছিল, তা এখন দৃষ্টির অতীত। তবে সূর্যের দিকে পৃথিবী তার অন্য পিঠটা ঘোরালেও শহরটা তখনো গরম, অদৃশ্য বরফগুলো থেকে জল ঝরেই যাচ্ছে।

স্কেট্‌স্‌ বগলে ছেলেটা যাচ্ছে শহরের রাস্তা দিয়ে।

অন্ধকারে চোখে পড়ে না যে তার একটা বোতাম খানিকটা কাপড় সমেত ছেঁড়া, মাফলারে বেগুনী কালির দাগ। দেখা যায় না যে তার ওভারকোট আর স্কী করার ট্রাউজারটার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে সে। সবই ওর খাটো, কিছুই মাপসই নয়। কিন্তু কাকে দুষব, যদি অত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠে বাচ্চারা?

টুপিটায় এখন কোন কানটা ঢাকা? কী এসে যায় তাতে! মুখে এসে যখন লাগে বসন্তের উষ্ণ সজল নিশ্বাস, তখন ওটা কিছুই নয়, কান জমে যাবে না। শুধু সারা দিন জল ভেঙে ছুটোছুটি করায় জুতো জোড়া উঠেছে ভিজে, ঠাণ্ডা লাগছে পায়ে।

লম্বা দশাসই একটা লোকের কথা ভাবছে ছেলেটা, গায়ে তার কালো জানোয়ারের ছাল দিয়ে তৈরি কোর্তা, আছে তার যুদ্ধের অর্ডার, তামাক খাওয়া পুরনো পাইপ, ফিল্ড ডাকঘরের নম্বর মারা স্যানিটারি ইউনিটের দেওয়া প্রেসক্রিপ্‌শন। একটা লোকের কথা ভাবছে সে, সারা জীবনেও যা তার জোটে নি। এখন তাকে পাওয়া গেল, কিন্তু সে তো তার নয়...

সের্গেইয়ের বদলে সে হলে সবকিছু ফেলে রেখে সে ছুটে আসত বাপের কাছে... উঁহুঁ, বাবাকে ছেড়ে কোনো দিদিমার কাছে, কোনো সাপোজকেই সে যেত না। সর্বদাই সে থাকত তার সঙ্গে সঙ্গে, ফলে যখনই দরকার সাহায্য করতে পারত।

ছেলেটার খেয়ালই নেই যে তার ডানদিকে দেখা দিয়েছে স্টেডিয়মের রেলিঙ। স্কেটিং রিঙ্কে বাজনা বাজছে না, জ্বলছে না ঝলমলে আলোগুলো, বরফ কেটে যাওয়া স্কেট থেকে ওঠা সেই চনমনে সড়-সড় শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

গেটের একমাত্র বাতিটির নিচে বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে:

'গরম আবহাওয়ার জন্যে রিঙ্ক বন্ধ'।

ছেলেটা মুঠো চাপতেই হাতে যন্ত্রণা করে উঠল। মুঠোর মধ্যে ছিল সেই টুকরোটা, যা বিঁধতে পারত বাখ্‌তিউকভের হার্টে। আরো জোরে মুঠো চাপল ছেলেটা, আরো ব্যথা করে উঠল।

হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল ছেলেটা। যন্ত্রণা সইতে পারে সে, রিঙ্ক বন্ধ তাতে তার বয়েই গেল। সৌভাগ্যবান সের্গেইকেও সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, যদিও বাবা আছে তার। আর যে-লোকটা তাকে 'খোকা রে' বলে ডেকেছে, সে বেঁচে থাকবে, সবুজ পাতা ফুটতেই সেরে উঠবে। আর পা জমে যাচ্ছে, সেও তো ভালো কথাই: তার মানে অনেক বরফ-গলা জল জমেছে শহরে, এসে যাচ্ছে বসন্ত, শিগগিরই ফুটে উঠবে সেই সবুজ পাতাগুলো।

খাটো ওভারকোটটার বোতাম খুলে ফেললে ছেলেটা, স্কেট্‌স্‌ জোড়া অন্য হাতে নিয়ে পা বাড়ালে বাড়ির দিকে।

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর-কিশোরীরা!

বাঙলা ভাষায় 'রামধনু' সিরিজে এবার আমরা প্রকাশ করলাম শিশু-সাহিত্যিক ইউরি ইয়াকভলেভের গল্পগুচ্ছের বইটি।

এই সিরিজে আগেই বেরিয়েছে:

'বৃষ্টি আর নক্ষত্র' — সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন জাতির লেখকদের গল্প-সংকলন। তাতে ছবি এঁকেছেন মস্কোর এক ইশকুলের ছাত্রী।

'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা' — অসংখ্য ফোটোগ্রাফে শোভিত ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কথা।

'যাদু তীর' — ল্যুবোভ ভরোঙ্কভার বই, তাতে আছে দুটি বড়ো গল্প, মজার কাহিনী 'যাদু তীর' আর পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় একটি খুকির জীবন নিয়ে 'শহরের মেয়ে'।

'ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা' — লিখেছেন আনাতোলি আলেক্সিন, মনকাড়া মজার বই, নায়ক-নায়িকাদের নানা অ্যাডভেঞ্চারে ভরা।

'পৃথিবী দেখছি' — বিশ্বের প্রথম ব্যোমনাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ইউরি গাগারিন তাঁর ঐতিহাসিক মহাকাশ-যাত্রার কথা বলেছেন, শুনিয়েছেন তাঁর জীবন ও শিক্ষার কাহিনী, গাঁয়ের সাধারণ ছেলেটি কী করে মহাকাশ জয় করল সেই বিবরণ। বহু প্রামাণিক ফোটোগ্রাফ আছে বইয়ে।

এসব বই তোমাদের আর তোমাদের গুরুজনদের কেমন লাগল, কী তোমাদের ইচ্ছে, তা জানতে পেলে প্রকাশালয় খুশি হবে।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Ю. Яковлев

ИГРА В КРАСАВИЦУ
(Рассказы)

на языке бенгали

Перевод сделан по книгам:
Ю. Яковлев «Непослушный мальчик Икар», Издательство «Детская литература», 1968.
Ю. Яковлев «Где стояла батарея», Издательство «Детская литература», 1971.